সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান ও মর্যাদার বিষয়ে আহলে সুন্নাতের আকীদা-বিশ্বাস

عقيدة أهل السنة حول مكانة الصحابة ومنزلتهم

< بنغالي >

ড. মো: আমিনুল ইসলাম

১৪৩৬

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

عقيدة أهل السنة والجماعة حول مكانة الصحابة ومنزلتهم

د/ محمد أمين الإسلام

ꕥ

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

ভূমিকা

“নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য ও হিদায়াত প্রার্থনা করি আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আর যাকে পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আর শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি।”

অতঃপর

বস্তুত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য তাদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদা-বিশ্বাস হলো মাটির নিচে রক্ষিত প্রধান মূল্যবান সম্পদের মতো। তাদের ইতিহাস বিকৃত ও কুৎসিত হতে বাধ্য, যখন তা মূল আকীদা থেকে সরে গিয়ে অধ্যয়ন করা হয়।

আর এ বিষয়ের গুরুত্ব আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের সকল আকীদার কিতাবেই পাই, যা তার গুরুত্বের বিষয়টিকে খুব চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের কিতাবসমূহ থেকে একটি কিতাবও আমরা পাবো না, যাতে আকীদার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে অথচ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের প্রসঙ্গে আলোচনা হয় নি; অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকটি আকীদার কিতাবেই সাহাবীগণের সম্পর্কিত আকীদার বিষয়টি

আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, আল-লালকায়ী'র শরহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাত (شرح أصول اعتقاد أهل السنة), ইবনু আবি 'আসেমের 'আস-সুন্নাহ' (السنة), আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বলের 'আস-সুন্নাহ' (السنة), ইবন বাত্তার 'আল-ইবানা' (الإبانة), আস-সাবুনীর 'আকিদাতু আহলিস সালফ আসহাবিল হাদীস' (عقيدة أهل السلف أصحاب الحديث) ইত্যাদি। বরং আহলে সুন্নাহ'র ইমামদের প্রত্যেকেই যখন তার আকীদা আলোচনা করেন, তখন এক পৃষ্ঠা বা তার চেয়ে কম হলেও সাহাবীগণের বিষয়ে আলোচনা করাটাকে জরুরি মনে করেন। হয় তাদের ফযীলত ও মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে অথবা খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা সম্পর্কে অথবা তাদের আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতার বিষয়ে অথবা তাদেরকে গালি ও তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা থেকে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে অথবা তাদের মাঝে সংঘটিত (অনাকাঙ্খিত) ঘটনার আলোচনা ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে ... ইত্যাদি ইত্যাদি।[১]

এ জন্যই আমরা আমাদের এ আলোচনায় পরিকল্পনা নিয়েছি যে, আমরা এ আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব উপস্থাপন করব। আর যখন সাহাবীগণের ইতিহাস আলোচনা হবে, তখন আলোচনাটি কেন্দ্রীভূত হবে আকীদার দৃষ্টিকোণ থেকে, আবার কখনও অপরাপর দিকসমূহ আলোচনা হবে সাধারণভাবে, যাতে এ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। উদাহরণস্বরূপ সাহাবীগণকে গালি দেওয়ার বিধানসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা। আরও ইঙ্গিত করা সাহাবীগণের ইতিহাস কেন্দ্রিক বর্ণিত বর্ণনাসমূহের বিশ্লেষণ

---

[1] উদাহরণস্বরূপ দেখুন: আল-লালকায়ী, শরহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাত, ১০/১৫১-১৮৬, লেখক সেখানে আহলে সুন্নাহ'র দশজন বড়মাপের ইমামের আকীদার উল্লেখ করেছেন, তারা সকলেই আমরা যা উল্লেখ করেছি, সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন; আর তা সম্পাদনা করেছেন ড. আহমদ সা'দ হামদান আল-গামেদী।

ও পর্যালোচনার আবশ্যকতার দিকে।

সুতরাং এ আলোচনাটিকে আমরা সাহাবীগণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য একটি আবশ্যকীয় প্রবেশপথ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি, যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন ইতিহাসবিদ এবং গবেষক, যিনি বিভিন্ন দল-উপদল ও তাদের উক্তিসমূহ নিয়ে গবেষণা করেন। আর অনুরূপভাবে তার জন্যও জরুরি হবে যিনি সাহাবীগণের মধ্য থেকে কারও কারও জীবনী অধ্যয়ন করতে চাইবেন ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর আমরা আলোচনাটিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে বিভক্ত করেছি:

প্রথমত: সাহাবীগণের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দিক থেকে তাদের স্তর ও শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: আল-কুরআনুল কারীম ও পবিত্র সুন্নাহ থেকে তাদের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ। অতঃপর আমরা কতিপয় আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীস ইমামদের কারও কারও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ নির্বাচন করেছি, যা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবে।

তৃতীয়ত: কোনো কিছুই সাহাবীগণের মর্যাদার সমান নয়। তাতে আমরা তাদের পরবর্তীদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি আলোচনা করেছি।

চতুর্থত: তাদেরকে প্রদত্ত গালির প্রকার ও প্রত্যেক প্রকারের বিধান; তাতে আমরা যে গালি তাদের ন্যায়পরায়ণতায় আঘাত করে এবং যা তার চেয়ে নিম্নমানের -এ উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করেছি। অনুরূপভাবে আমরা ঐ ব্যক্তির বিধান স্পষ্ট করেছি, যে ব্যক্তি এমন সাহাবীকে গালি দেয়, যার মর্যাদা বর্ণনায় মুতাওয়াতির পর্যায়ের শর‘ঈ বক্তব্য রয়েছে এবং যার মর্যাদা বর্ণনায় এর চেয়ে কম মানের বর্ণনা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তাদের সকলকে গালি দেয় অথবা তাদের কাউকে কাউকে গালি দেয়। আর আমরা এ অধ্যায়ের শেষ অংশে ইঙ্গিত করেছি ঐ ব্যক্তির বিধান সম্পর্কে, যে ব্যক্তি মুমিনদের জননী

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে গালি দেয়, যাকে আল্লাহ তার থেকে পাক-পবিত্র বলে ঘোষণা করছেন। আর সেখান থেকে অবশিষ্ট মুমিন জননীদের বিধি-বিধান আলোচনা করেছি।

পঞ্চমত: তার পরে আলোচনা সাজিয়েছি এমন একটি পরিচ্ছেদ দ্বারা, যাতে আছে তাদেরকে গালি দেওয়া ও গালির অপরিহার্য পরিণতি বা ফলাফল সংক্রান্ত মনীষীদের বাণী বা কথার উদ্ধৃতি (الآثار)।

ষষ্ঠত: তাদের মাঝে সংঘটিত (অনাকাঙ্খিত) ঘটনার ব্যাপারে অবস্থান, তাতে কতগুলো নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করা হয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক গবেষকের জন্য জরুরি। যখন তিনি তাদের মাঝে সংঘটিত (অনাকাঙ্খিত) ঘটনার ব্যাপারে গবেষণা করেন, যাতে তাদেরকে গালি দেওয়ার মতো অপরাধে জড়িয়ে না যান।

সপ্তমত: তাদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের উক্তিসহ তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে একটি উপসংহারের মাধ্যমে আলোচনাটি শেষ করা হয়েছে, যাতে সহাবীগণের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।

অতঃপর, হে আমার পাঠক বন্ধু!

আমি মনে করি না যে, আমি নতুন কিছু নিয়ে আসতে পেরেছি; আমি শুধু ইমামদের নির্বাচিত কথাগুলো একত্রিত করেছি এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়েছি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আর তা হলো এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং আকীদা বিনষ্ট করে এমন প্রত্যেক প্রকার নেতিবাচক বিষয়ে সতর্ক করা। সুতরাং তা এমন একটি উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা, যাকে এমন প্রত্যেকটি চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে সন্নেবেশিত করা হবে, যা পূর্ববর্তী মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ লিপিবদ্ধ

করেছেন; চাই সেটা আকীদার ক্ষেত্রে হউক অথবা বিভিন্ন ফিরকা তথা দল বা গোষ্ঠির ক্ষেত্রে হউক অথবা ইতিহাসের ক্ষেত্রে হউক অথবা হাদীসের ক্ষেত্রে হউক।

আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসার তাওফীক দান করেন এবং তাদের দল বা জোটের সাথে আমাদেরকে হাশরের ব্যবস্থা করেন। আর আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছেই তাওফীক ও সঠিক পথ চাই।

وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وآله وصحبه.

ড. মো: আমিনুল ইসলাম,
মার্চ, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ,
দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া কামিল মাদরাসা,
লাকসাম, কুমিল্লা।

প্রথম অধ্যায়: সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় ও শ্রেণিবিন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ: সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়

সাহাবা শব্দটি বহুবচন, একবচনে সাহাবী, আক্ষরিক অর্থ সহচর, সঙ্গী, সাথী ইত্যাদি। আর পরিভাষায় সাহাবীর পরিচয় দিতে গিয়ে হাফেয ইবন হাজার 'আসকালানী রহ. বলেন,

«الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلّم مؤمنا به , ومات على الإسلام».

"সাহাবী হলেন তিনি, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানদার হয়ে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং ইসলামের ওপর মারা গেছেন।"[2]

ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

من صحب النبي صلى الله عليه و سلم , أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.

"মুসলিমগণের মধ্য থেকে যিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য লাভ করেছেন অথবা তাকে দেখেছেন, তিনি তাঁর সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।"[3]

মুহাদ্দিসগণের মতে:

هو كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন -এমন প্রত্যেক মুসলিম সাহাবী বলে গণ্য।"[৪]

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস বলেন, "যিনি মুসলিম অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু

---

[2] উদ্ধৃতি: ড. নূর উদ্দিন 'আতর, 'মানহাজুন্ নাকদ ফী 'উলুমিল হাদীস', দারুল ফিকর, প্রথম মুদ্রণ: ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১১৬; সম্পাদনা পরিষদ, আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত, হোসাইনিয়া কুতুবখানা, দেওবন্দ (তা.বি), পৃষ্ঠা ৫০৭।

[3] সহীহ বুখারী, সহাবায়ে কেরামের ফযীলত অধ্যায়।

[৪] ড. 'আজ্জাজ আল-খতীব, 'উসূলুল হাদিস', দারুল ফিকর, চতুর্থ সংস্করণ: ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৩৮৫

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসেবে মারা গেছেন।”[৫]

মোটকথা: মুসলিম অবস্থায় যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন বা তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন এবং মুসলিম হিসেবে মারা গেছেন, তিনিই সাহাবী বলে পরিচিত, চাই তিনি কম বয়সের হউন অথবা পূর্ণবয়স্ক হউন, চাই তাঁর সাহচর্য লাভের বিষয়টি কম সময়ের হউক অথবা বেশি সময় ধরে হউক।

---

[৫] ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, মাযহাব: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, সিয়ান পাবলিকেশন, প্রথম বংলা সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা ২২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সাহাবীগণের স্তর ও শ্রেণিবিন্যাস

হাকেম নীশাপুরী রহ. তার 'মা'রেফাতু 'উলুমিল হাদীস' নামক গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তিতা এবং মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে তাদের উপস্থিতির দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দানের মাধ্যমে তাদেরকে বারোটি স্তর ও শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন।[৬] সুতরাং তিনি বলেন,

১. প্রথম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন, আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম।

২. দ্বিতীয় স্তরের সাহাবীগণ হলেন দারুন নদওয়ায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ। আর এটা হলো উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, তখন তাকে দারুন নদওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তিনিসহ মক্কাবাসীর মধ্য থেকে একদল সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

৩. আর তৃতীয় স্তরের সাহাবীগণ হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবী, যারা হাবশায় হিজরত করেছেন।

৪. আর চতুর্থ স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা 'আকাবা নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শপথ গ্রহণ করেছেন।

৫. আর পঞ্চম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শপথ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের অধিকংশ ছিলেন আনসার সাহাবী।

৬. আর ষষ্ঠ স্তরের সাহাবীগণ হলেন সেসব মুহাজির, যারা মদীনায় প্রবেশ ও

---

[৬] উদ্ধৃত: ড. নূর উদ্দিন 'আতর, 'মানহাজুন্ নাকদ ফী 'উলুমিল হাদীস' পৃষ্ঠা ১১৯-১২০

মসজিদ বানানোর পূর্বে ‘কুবা’ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছেছেন।

৭. আর সপ্তম স্তরের সাহাবী হলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।”[7]

৮. আর অষ্টম স্তরের সাহাবী হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবীগণ, যারা বদর যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায় হিজরত করেছেন।

৯. আর নবম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা বায়‘আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেছেন:

﴿لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ١٨﴾ [الفتح: ١٨]

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই‘আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন। ফলে তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮] আর বায়‘আতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল হুদায়বিয়া নামক স্থানে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফির কর্তৃক ওমরা পালনে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

---

[7] সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৬০৮

১০. আর দশম স্তরের সাহাবী হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবীগণ, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ, 'আমর ইবনুল 'আস, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ এবং এ স্তরের সাহাবীগণের সংখ্যা অনেক।

১১. আর একাদশ স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তারা হলেন কুরাইশ গোত্রের একটি দল।

১২. আর দ্বাদশ স্তরের সাহাবীগণ হলেন ছোট্ট শিশু-কিশোর কম বয়সীদের মধ্য থেকে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন মক্কা বিজয়ের দিন, বিদায় হজের দিনসহ বিভিন্ন সময়ে এবং তাদেরকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়।

আবার মোটামুটিভাবে সাহাবীগণের স্তরকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাসের বিষয়টিও প্রসিদ্ধ:

প্রথম স্তর: বড় বড় সাহাবীগণের স্তর। যেমন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন এবং প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ।

দ্বিতীয় স্তর: মধ্যম স্তরের সাহাবীগণ।

তৃতীয় স্তর: ছোট স্তরের সাহাবীগণ, যারা বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন অথবা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ছোট ছিলেন।[৪]

উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং তাদের মান-মর্যাদার মাঝেও তারতম্য রয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু তারা সকলেই যে ন্যায়পরায়ণ এবং নবীগণের পরেই তারা যে দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের

---

[৮] উদ্ধৃত: ড. নূর উদ্দিন 'আতর, 'মানহাজুন্ নাকদ ফী 'উলুমিল হাদীস', পৃষ্ঠা ১২০

প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের সকলের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।”[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿لَا يَسۡتَوِي مِنكُم مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةٗ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ [الحديد: ١٠]

“তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা (এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে, যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।” [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১০]

সুতরাং সততাও ন্যায়পরয়ণতার প্রশ্নে সাহাবীগণের সকলেই সমান।

সাহাবীগণের সংখ্যা: আর সাহাবীগণের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় এক লক্ষের অধিক হিসেবে। আর আবু যুর'আ আর-রাযী তাদের সংখ্যা নির্ণয় করেন এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার বলে।[9]

[9] উদ্ধৃত: ড. নূর উদ্দিন 'আতর, 'মানহাজুন্ নাকদ ফী 'উলুমিল হাদীস', পৃষ্ঠা ১২০।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাহাবীগণের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ:

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সাহাবীগণের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নিকট সাহাবীগণের ‘আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি অকাট্য আকীদা (বিশ্বাস) বিষয়ক মাসআলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত অথবা বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে জানা দীনী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এর স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য দলীল রয়েছে; নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো:

প্রথমত: আল-কুরআন থেকে সাহাবীগণের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ:

প্রথম আয়াত: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا ١٨﴾ [الفتح: ١٨]

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই‘আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন। ফলে তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮]

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন,

«كنا ألفا وأربعمائة».

“আমরা (সে শপথ অনুষ্ঠানে) ছিলাম সংখ্যায় এক হাজার চারশত।”[10]

সুতরাং এ আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেছেন আর এ তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধির সংবাদ আল্লাহই পরিবেশন করেছেন।

---

[10] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: মাগাযী, পরিচ্ছেদ: হুদায়বিয়ার যুদ্ধ, হাদীস নং ২৯২৩; ফতহুল বারী: ৭/৫০৭ (রাইয়ান প্রকাশনা)।

আর আল্লাহ ব্যতীত তা সম্পন্ন করার ক্ষমতা অন্য কেউ রাখে না। আর তা হলো তাদের অভ্যন্তরীণ ও হৃদয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার পরিশুদ্ধি। আর সেখান থেকেই তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। (আর আল্লাহ তা'আলা যার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, কুফুরীর ওপর তার মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তার শিক্ষা হলো ইসলামের ওপর মারা যাওয়া। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও ওপর প্রযোজ্য হবে না, যার ব্যাপারে তিনি জানেন যে, তার মৃত্যু হবে ইসলামের ওপর)।[11]

আর সহীহ মুসলিমে যা বিদ্যমান রয়েছে, তা এ বক্তব্যকে আরও সুদৃঢ় করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا».

“আল্লাহ চায় তো গাছের নিচে শপথ গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।”[12]

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন: “আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি একটি প্রাচীন গুণ। সুতরাং তিনি শুধু ঐ বান্দার ওপরই সন্তুষ্ট হন, যার ব্যাপারে তিনি জানেন যে, সে তাকে সন্তুষ্টির আবশ্যকীয় উপাদানগুলো পূর্ণ করে দিবেন। আর যার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন, তার ওপর তিনি কখনও অসন্তুষ্ট হন নি। অতএব, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই জান্নাতের অধিবাসী, যার ব্যাপারে আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যদিও তার ওপর তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়টি ছিল তার ঈমান আনয়ন ও সৎকর্মের পরে। সুতরাং তিনি এ বিষয়টি উল্লেখ করেন তার গুণগান ও প্রশংসা করার ক্ষেত্রে। অতএব, তিনি

---

11 আস-সাওয়ায়েক আল-মুহরিক্বা, পৃষ্ঠা ৩১৬।

12 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: গাছের অধিকারী বায়'আতে রিদওয়ানের অনুসারীগণের মর্যাদা, হাদীস নং ৬৫৬০।

যদি জানতেন যে, সে এর পরবর্তীতে এমন কাজ করবে, যাতে প্রতিপালক অসন্তুষ্ট হবেন, তাহলে সে জান্নাতের অধিবাসী হত না।”[13]

ইবনু হাযম রহ. বলেন: “যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সংবাদ জানিয়েছেন, তিনি তাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে জানেন এবং তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন; আর তাদের উপর নাযিল করেছেন প্রশান্তি। সুতরাং কারও জন্য বৈধ হবে না তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করা অথবা তাদের ব্যাপারে কখনও সন্দেহ পোষণ করা।”[14]

দ্বিতীয় আয়াত: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩﴾ [الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু‘ ও সাজদাহয় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডল সাজদাহর প্রভাবে পরিস্ফুট; এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের

---

[13] ইমাম উবনু তাইমিয়্যাহ, আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৭২, ৫৭৩, মুদ্রণ: দারুল কুতুব আল-‘ইলমিয়াহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মহি উদ্দীন আব্দুল হামীদ।

[14] আল-ফাসলু ফিল মিলালে ওয়ান্নিহাল: ৪/১৪৮।

অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে -আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের।”[সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯] ইমাম মালেক রহ. বলেন: “আমার নিকট এ খবর এসেছে যে, খ্রিস্টানগণ যখন ঐসব সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমকে দেখেছিল, যারা শাম (সিরিয়া) জয় করেছেন, তখন তারা বলতে লাগল: আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তারা ঐসব হাওয়ারীদের চেয়ে উত্তম, যাদের ব্যাপারে আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি। আর এ প্রসঙ্গে তারা সত্যই বলেছে। কারণ, এ উম্মত (জাতি) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে সম্মানিত। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। আর আল্লাহ তা‘আলা নাযিলকৃত কিতাবসমূহে ও হাদীসের মধ্যে তাদের কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। আর এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা সেখানে বলেছেন: ﴿ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ﴾ “এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত”। অতঃপর তিনি বলেন: ﴿وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ﴾ “আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা”। ﴿فَـَٔازَرَهُۥ﴾ “তারপর তা শক্ত হয়”। অর্থাৎ মজবুত হয়। ﴿فَٱسۡتَغۡلَظَ﴾ “তারপর তা পুষ্ট হয়” অর্থাৎ তা পুষ্ট ও লম্বা হয়। ﴿فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ﴾ “অতঃপর তা কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক” অর্থাৎ অনুরূপ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। তারা তাকে শক্তিশালী করেছেন, সমর্থন করেছেন এবং তাকে সাহায্য করেছেন। সুতরাং তাঁর সাথে তাদের সম্পর্ক গাছের সাথে পাতা বা কচিপাতার সম্পর্কের মতো, (আল্লাহ) তাদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি

করেন।"[15] ইবনুল জাওযী বলেন, "এ গুণটি অধিকাংশের নিকট সকল সাহাবীর জন্য সাব্যস্ত।"[16]

তৃতীয় আয়াত: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ۝٨ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٩ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝١٠﴾ [الحشر: ٨، ١٠]

"এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। এরাই তো সত্যাশ্রয়ী। আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোনো (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। বস্তুত যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও

[15] ইবনু আবদিল বার, আল-ইসতিয়াব, ১/৬, মুদ্রণ, দারুল কিতাব আল-আরাবী -ইবনুল কাসিম থেকে আল-ইসাবা গ্রন্থের প্রান্তটিকা বা হাশিয়াসহ; তাফসীরু ইবন কাছীর: ৪/৩৪০, মুদ্রণ: দারুল মা'আরেফা, বাইরুত, সনদ ব্যতীত।

[16] যাদুল মাসীর, ৪/২০৪।

ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।”[সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৮-১০]

আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতসমূহের মধ্যে ‘ফায়’[17] তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের হকদারদের অবস্থা ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। আর তারা হলেন তিন প্রকারের:

প্রথম প্রকার: ﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ﴾ অর্থাৎ নিঃস্ব মুহাজিরগণ।

দ্বিতীয় প্রকার: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ﴾ অর্থাৎ মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় প্রকার: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ﴾ অর্থাৎ যারা তাদের পরে এসেছে।

আর ইমাম মালেক রহ. এ আয়াত থেকে কি সুন্দর ফতোয়া উদ্ভাবন করছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবীগণকে গালি দিবে, তার জন্য ‘ফায়’ বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে কোনো অংশ নেই। কারণ, সে ঐসব সাহাবীগণের গুণে গুণান্বিত হতে পারে নি, আল্লাহ তা‘আলা যাদের প্রশংসা করেছেন। তাদের কথায়:

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

---

[17] ‘ফায়’ শব্দের অর্থ: যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অথবা বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ।

সা'আদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«الناس على ثلاث منازل: فمضت منزلتان و بقيت واحدة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت قال : ثم قرأ : ﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا﴾ [الحشر: ٨] فهؤلاء المهاجرين وهذه منزلة قد مضيت: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ﴾ [الحشر: ٩] قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضيت ثم قرأ: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠] قد مضيت هاتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت: أن تستغفروا لهم»

"মান-মর্যাদার দিক থেকে মানুষ তিন শ্রেণী বা স্তরে বিভক্ত। সুতরাং দুই শ্রেণির মানুষ অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর অবশিষ্ট আছে এক শ্রেণির মানুষ। অতএব, সবচেয়ে সুন্দর হয় যখন তোমাদের অবস্থান হবে ঐ স্তরের সাথে যা অবশিষ্ট আছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি পাঠ করেন:

﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا﴾ [الحشر: ٨]

"এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৮]

তারা হলেন মুহাজিরগণ এবং এ স্তরটি অতিবাহিত হয়ে গেছে।

﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ﴾ [الحشر: ٩]

"আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোনো (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯]

তিনি বলেন, তারা হলেন আনসার। আর এ স্তরটিও অতিবাহিত হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন:

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

ঐ দু'টি স্তর অতিবাহিত হয়ে গেছে; আর বাকি আছে এ স্তরটি। সুতরাং সবচেয়ে সুন্দর হবে যখন তোমাদের অবস্থান হবে ঐ স্তরের সাথে, যা অবশিষ্ট আছে। তিনি বলেন: তোমরা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।"[১৮]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন,

«أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَبُّوهُمْ».

"তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে। অথচ তারা তাদেরকে গালি

---

[18] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৭৪; হাকেম, আল-মুসতাদরাক, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং ৩৮০০। ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দিয়েছে।”[19]

আবু না'ঈম বলেন, “সুতরাং তার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাদেরকে অবাধ্যতার মাধ্যমে অস্বীকার করে। তুমি কি লক্ষ্য করবে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর সাহাবীগণকে ক্ষমা করে দিতে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং তাদের প্রতি পক্ষপুট অবনত করে দিতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩﴾ [ال عمران: ١٥٩]

“আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর ওপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন।”[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢١٥﴾ [الشعراء: ٢١٥]

“এবং যারা আপনার অনুসরণ করে, সেসব মুমিনদের প্রতি আপনার পক্ষপুট অবনত করে দিন।” [সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ২১৫]

সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে গালি দিবে, ঘৃণা করবে এবং তাদের মধ্যকার ব্যাখ্যা বা মন্তব্য ও সংঘটিত যুদ্ধসমূহকে অসুন্দর উদ্দেশ্যে বয়ে বেড়াবে, সে

---

[19] সহীহ মুসলিম, তাফসীর অধ্যায়, বাব নং- ২, হাদীস নং ৭৭২৪

ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ, শিক্ষা ও অসীয়্যত (উপদেশ) থেকে বিচ্যুত। সে তাদের ব্যাপারে তার জিহ্বাকে প্রসারিত করে শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি কলুষিত অন্তর ও মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে।"[20]

মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«لا تسبوا أصحاب محمد إن الله قد أمر بالاستغفار لهم و قد علم أنهم سيقتتلون».

"তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহাবীগণকে গালি দিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি জানেন যে, তারা অচিরেই নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে।"[21]

চতুর্থ আয়াত: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠]

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নহর প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।"[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০]

---

[20] আবূ না'ঈম, আল-ইমামা, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৬, পর্যালোচনা: ড. আলী ফকীহী, মাকতাবাতুল 'উলুম ওয়াল হিকাম, মদীনা, প্রথম মুদ্রণ: ১৪০৭ হি.

[21] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৭৪; আরও দেখুন: মিনহাজুস সুন্নাহ, ২/১৪; আছার, ইমাম আহমদ, তা ফাযায়েল অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ১৮৭, ১৭৪১।

আর এ আয়াতের তাৎপর্য অত্যন্ত পরিষ্কার। ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, "পূর্ববর্তী সহাবীগণের ব্যাপারে আমার দায়িত্ব হলো নিঃশর্তভাবে তাদের সাথে ইহসান তথা সদাচরণ করা। আর তিনি (আল্লাহ) তাবেঈনদের ওপর সন্তুষ্ট নন যতক্ষণ না তারা তাদেরকে (সাহাবীগণকে) ইহসানের সাথে অনুসরণ করবে।"[22] আর তাদেরকে ইহসানের সাথে অনুসরণ করার অন্যতম দিক হলো তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

পঞ্চম আয়াত: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١٠﴾ [الحديد: ١٠]

"তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা (এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।"[সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১০]

আর আয়াতে উল্লিখিত الحسنى। শব্দের অর্থ হলো 'জান্নাত'। মুজাহিদ ও কাতাদা রহ. অনুরূপ বলেছেন।[23]

আর ইবন হাযম রহ. এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে দলীল গ্রহণ করেন যে, সাহাবীগণ সকলেই জান্নাতের অধিবাসী, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ﴾ [الحديد: ١٠]

"আর আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[সূরা আল-হাদীদ,

[22] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৭২

[23] তাফসীরু ইবন জারির: ২৭/১২৮, দারুল মা'রেফাহ, বাইরুত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০০ হি.

আয়াত: ১০]

ষষ্ঠ আয়াত: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ مِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٖ مِّنۡهُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١١٧﴾ [التوبة: ١١٧]

"আল্লাহ অবশ্যই নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটময় মুহূর্তে -তাদের এক দলের হৃদয় সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৭]

আর তাবুকের যুদ্ধে বিদ্যমান প্রায় সকল সাহাবীই উপস্থিত হয়েছিলেন; কিন্তু নারী ও অক্ষমদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর নিকট অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন তারা ব্যতীত। তবে যে তিনজন সাহাবী যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পিছনে রয়ে গেলেন, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে তাদের তাওবার ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়।

দ্বিতীয়ত: সুন্নাহ থেকে সাহাবীগণের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ:

প্রথম হাদীস: আবু সা‘ঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِى، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ».

"খালিদ ইবন ওয়ালিদ ও আব্দুর রহমান ইবন ‘আউফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার মধ্যে কিছু একটা সমস্যা হয়েছিল। এক পর্যায়ে খালিদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে গালি দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘তোমরা আমার সাহাবীগণের কাউকে গালি দিবে না। কারণ, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ

পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও দান করে, তবে সে তাদের এক মুদ[24] বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সাওয়াবও অর্জন করতে পারবে না।”[25]

ইবন তাইমিয়্যা রহ. আস-সারিমুল মাসলুল (الصارم المسلول) নামক গ্রন্থে বলেন: অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ রহ. ও অন্যান্য আলেমগণও বলেন: “প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য পেয়েছেন এক বছর অথবা এক মাস অথবা এক দিন অথবা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে শুধু তাকে দেখেছেন, তবে তিনিই তাঁর সাহাবী বলে গণ্য হবেন। যেহেতু তিনি তাঁর এ পরিমাণ সাহচর্য পেয়েছেন।

অতঃপর যদি বলা হয় কেন তিনি খালিদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে তাঁর সাহাবীগণকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন, যখন সেও তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে একজন ছিল? আর কেনই বা তিনি বললেন,

«لَوْ أن أحدكم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بلغ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ»

“তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও দান করে, তবে তা তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সমানও হবে না?” তখন আমরা বলব: যেহেতু আব্দুর রহমান ইবন ‘আউফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুসহ তার মতো সাহাবীগণ ছিলেন প্রথম সারির সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যারা এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গ দিয়েছেন, যে সময়ের মধ্যে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ তার মতো সাহাবীগণ তার প্রতি শত্রুতা করতেন।

---

[24] মুদ পরিমাপ যন্ত্রবিশেষ; তবে এখানে তুলনামূলক সামান্য পরিমাণকে বুঝানো হয়েছে।

[25] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: আমি যদি অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণকারী হতাম, হাদীস নং ৩৪৭০; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: সাহাবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমকে গালি দেওয়া হারাম, হাদীস নং ৬৬৫২

আর অপরদিকে তারা (পূর্ববর্তীগণ) তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছেন বিজয়ের পূর্বে এবং যুদ্ধ করেছেন। আর তাদের মর্যাদা অনেক বেশি তাদের চেয়ে, যারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছেন বিজয়ের পরে এবং যুদ্ধ করেছেন। তবে তাদের উভয় গ্রুপের জন্যই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং সহচর্যের দিক থেকে তারা হলেন স্বতন্ত্র, যেহেতু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ তার মতো সাহাবীগণ পূর্বের যুদ্ধে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন নি। কারণ, তিনি হলেন এমন সাহাবী, যিনি ইসলাম কবুল করেছেন হুদায়বিয়ার সন্ধির মতো বিজয়ের পরে এবং যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং তিনি তাকে ঐসব সাহাবীগণকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন, যারা তার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য লাভ করেছেন। আর যে ব্যক্তি রাসূলের সাহাবীর সাথে তার সম্পর্ক প্রথম সারির সাহাবীগণের সাথে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্কের ন্যায় আদৌ তাঁর সহচর্য লাভ করেন নি, এমনকি তার চেয়ে আরও অনেক দূরসম্পর্ক।[26]

দ্বিতীয় হাদীস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

« ... إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

"...নিশ্চয়ই সে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর তুমি কি জান, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। যার ফলে তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত কাজ কর। কারণ, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"[27]

---

[26] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৭৬।

[27] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: যুদ্ধবিগ্রহ, পরিচ্ছেদ: বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর ফযীলত, হাদীস নং

বলা হয়: তাঁর কথা: اعملوا (তোমরা কর)-এর মধ্যে যে আদেশ বা নির্দেশ রয়েছে, তা সম্মানের জন্য। “আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বদরী সাহাবী যে কাজই করুক, এ সত্য প্রতিশ্রুতির কারণে তিনি তাকে পাকড়াও করবেন না।” আরও বলা হয়: “এর অর্থ হলো: তাদের মন্দ কাজগুলো সংঘটিত হয় ক্ষমা অবস্থায়। সুতরাং মনে হয় যেন তা সংঘটিত হয় নি।”[28]

আর ইমাম নববী রহ. বলেন, “আলেমগণ বলেন, তার অর্থ হলো পরকালে তাদের জন্য ক্ষমার ব্যবস্থা থাকবে, তবে যদি তাদের কারও ওপর হদ তথা শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি অথবা অন্য কোনো শাস্তি আবশ্যক হয়, তবে তা তার ওপর দুনিয়াতেই প্রয়োগ করা হবে। আর কাযী ‘আইয়াদ্ব রহ. হদ বা শরী‘আত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগের ওপর ইজমা হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন। আর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের কারও কারও ওপর হদ কায়েম করেছেন। কুদামা ইবন মায‘উন বলেন, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসতাহকে হদের আঘাত করেছেন, অথচ তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী।”[29]

আর ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন: “আল্লাহ অধিক ভালো জানেন। নিশ্চয় এ সম্বোধনটিতে এমন এক জাতিকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা জানেন যে, তারা তাদের দীনকে ছেড়ে যাবে না; বরং তারা ইসলামের ওপর

৩৭৬২; মুসলিম, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের ফযীলত ও হাতেম ইবন আবি বালতা‘আ’র কাহিনী, হাদীস নং ৬৫৫৭

[28] ইবন হাজার ‘আসকালানী, মা‘আরেফাতুল খিসালিল মুকাফফারা, পৃষ্ঠা ৩১, সম্পাদনা: জাসিম আদ-দাওসারী, প্রথম মুদ্রণ: ১৪০৪ হি.

[29] ইমাম নববীর ব্যাখ্যাসহ সহীহ মুসলিম: ১৬/৫৬, ৫৭

মারা যাবে। আর তাদের কেউ কেউ কখনও কখনও পাপে জড়িয়ে যাবে, যেমনিভাবে অন্যরা পাপে জড়িয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঐ পাপের ওপর অব্যাহত রাখবেন না; বরং তিনি তাদেরকে খাঁটি তাওবা, ক্ষমা প্রার্থনা ও সৎকর্ম কারার তাওফীক দিবেন, যা এর প্রভাবকে মুছে দিবে। আর তারা ভিন্ন অন্যদেরকে ব্যতীত শুধু তাদেরকে এর দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। কারণ, তাদের মধ্যে এ বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়েছে আর তাদের জন্য ক্ষমার ব্যবস্থা রয়েছে। আর এটি তাদের দ্বারা সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষমা অর্জিত হওয়াটাকে বাধাগ্রস্ত করে না, যেমনিভাবে তা দাবি করে না যে, ক্ষমার প্রতিশ্রুতির কারণে তারা ফরযসমূহ পালন করা বন্ধ করে দিবে। সুতরাং যদি নির্দেশসমূহ পালনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা লংঘিত হয়, তবে এর পরে তাদের সালাত, সাওম, হজ, যাকাত ও জিহাদের প্রয়োজন হয় না আর এটা অসম্ভব।”[30]

তৃতীয় হাদীস: ‘ইমরান ইবনুল হোসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا».

“আমার যুগের উম্মত হলো আমার শ্রেষ্ঠ উম্মত, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে তারা শ্রেষ্ঠ, তারপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে তারা শ্রেষ্ঠ। ‘ইমরান বলেন: আমি জানিনা, তিনি তাঁর যুগের পরে দু'টি যুগের কথা উল্লেখ করেছেন, নাকি তিনটি যুগের উল্লেখ করেছেন।”[31]

---

[30] ইবনুল কায়্যিম, আল-ফাওয়ায়েদ, আল-মাকতাবাতুল কায়্যিমা, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৪ হি., পৃষ্ঠা ১৯।

[31] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

চতুর্থ হাদীস: আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ».

"তারকারাজি হলো আকাশের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। সুতরাং যখন তারকারাজি চলে যাবে তখন আকাশের ওপর প্রতিশ্রুত বিপর্যয় নেমে আসবে। আর আমি হলাম আমার সাহাবীগণের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। সুতরাং যখন আমি চলে যাব তখন আমার সাহাবীগণের ওপর প্রতিশ্রুত বিপর্যয় নেমে আসবে। আর আমার সাহাবীগণ হলো আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। সুতরাং যখন আমার সাহাবীগণ চলে যাবে তখন আমার উম্মতের ওপর প্রতিশ্রুত বিপর্যয় নেমে আসবে।"[32]

পঞ্চম হাদীস: উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أكرموا أصحابي، فإنهم خياركم».

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান কর; কারণ, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম।"[33]

সাহাবীদের ফযীলত, হাদীস নং ৩৪৫০; মুসলিম, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: সাহাবী, তৎপরবর্তী ও তৎপরবর্তীদের ফযীলত, হাদীস নং ৬৬৩৮

[32] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ এবং তার সাহাবীদের উপস্থিতি উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ, হাদীস নং ৬৬২৯

[33] হাদীসখানা ইমাম আহমদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেন; আর হাকেম সহীহ সনদে বর্ণনা করেন;

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে:

«احفظوني في أصحابي».

“তোমরা আমাকে আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে হিফাযত কর।”[34]

ষষ্ঠ হাদীস: ওয়াসেলা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني».

“তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকবে, যে আমাকে দেখেছে এবং আমার সহচর্য লাভ করেছে। আল্লাহর কসম! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকবে, যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে দেখেছে, যে আমাকে দেখেছে এবং যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তির সহচর্য লাভ করেছে, যে আমার সহচর্য লাভ করেছে।”[35]

সপ্তম হাদীস: আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

দেখুন: মেশকাতুল মাসাবীহ, ৩/১৬৯৫; আর মুসনাদে আহমদ, বিশ্লেষণে আহমদ শাকের: ১/১১২

[34] ইবন মাজাহ: ২/৬৪; আহমদ: ১/১৮; হাকেম: ১/১১৪; তিনি বলেন: হাদিসটি সহীহ; আর যাহাবীও হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন; আর আল-বুসাইরী বলেন: সনদের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত; যাওয়ায়েদু ইবন মাজাহ: ৩/৫৩

[35] হাদীসখানা ইবন আবি শায়বা তার ‘মুসান্নাফে’ বর্ণনা করেছেন: ১২/১৭৮; ইবন আবি ‘আসেম, আস-সুন্নাহ: ৩/৬৩০; তাবারানী, আল-কবীর: ২২/৮৫; আবু না‘য়ীম, মা‘আরেফাতুস সাহাবা: ১/১৩৩; হাফেয ইবন হাজার ‘আসকালানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, আল-ফাতহ: ৭/৫; আর হাইসাম ‘আল-মাজমা‘: (১০/২০) এর মধ্যে বলেন: তাবারানী এই হাদীসখানা অনেকগুলো সনদে বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে একটি সনদ বিশুদ্ধ।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار».

“আনসারদেরকে ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ আর আনসারদেরকে ঘৃণা করা নিফাকীর লক্ষণ।”[36]

আর অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের ব্যাপারেও বলেন,

«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله ».

“আনসারদেরকে শুধু মুমিনরাই ভালোবাসে আর তাদেরকে শুধু মুনাফিকরাই ঘৃণা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহও তাকে ভালোবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করবে আল্লাহও তাকে ঘৃণা করবেন।”[37]

আর এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস রয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে তাদের মর্যাদার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর বিস্তারিতভাবে তাদের মর্যাদা ও ফযীলতের বিবরণ অনেক বেশি। ইমাম আহমদ রহ. দুই খণ্ডে লিখিত তার ‘ফাযায়েলুস সাহাবা নামক গ্রন্থে প্রায় দুই হাজার হাদীস ও আছার উল্লেখ করেছেন। আর এ বিষয়ে এ গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধশালী গ্রন্থ।[38]

---

[36] সহীহ বুখারী: ৭/১১৩; সহীহ মুসলিম: ১/৮৫

[37] সহীহ বুখারী: ৭/১১৩; সহীহ মুসলিম: ১/৮৫ (হাদিসটি বারা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত)।

[38] এ গ্রন্থটি ড. অসিউল্ল্যাহ ইবন মুহাম্মদ আব্বাস সম্পাদনা করেছেন; আর তা ১৪০৩ হিজরিতে উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পূর্বে আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

পূর্ববর্তী আয়াত ও হাদীসসমূহের গভীরতা থেকে সাহাবীগণের গুণাবলীর ব্যাপারে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি:

প্রথমত: নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকসমূহ পরিশুদ্ধ করেছেন।

১. যাদের বাহ্যিক দিকসমূহ পরিশুদ্ধ হয়েছে, তাদেরকে তিনি সর্বোচ্চ প্রশংসিত চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্য থেকে যেমন:

১. ১.

﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ﴾ [الفتح: ٢٩]

"আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

১. ২.

﴿وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ٨﴾ [الحشر: ٨]

"আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। এরাই তো সত্যাশ্রয়ী।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৮]

১. ৩.

﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٌۚ﴾ [الحشر: ٩]

"এবং তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোনো (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না। আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৮]

২. আর তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার সাথেই নির্দিষ্ট। আর তিনিই একমাত্র মনের খবর জানেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের অভ্যন্তরীণ সততা ও বিশুদ্ধ নিয়তের সংবাদ দিয়েছেন। অতএব উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন:

২. ১.

﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا ۝١٨﴾ [الفتح: ١٨]

“অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন। ফলে তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮]

২. ২.

﴿يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ﴾ [الحشر: ٩]

“তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে, তাদেরকে ভালোবাসে।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৯]

২.৩.

﴿يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا﴾ [الحشر: ٨]

“তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৮]

২.৪.

﴿لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ مِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٖ مِّنۡهُمۡ﴾ [التوبة: ١١٧]

“আল্লাহ অবশ্যই নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছিল সংকটময় মুহূর্তে -তাদের এক দলের হৃদয় সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর।” [সুরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৭]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করেছেন, যখন তিনি তাদের নিয়ত ও তাওবার সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারলেন। আর তাওবা হলো শুধুমাত্র অন্তরের কাজ, যা সর্বজনবিদিত।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাদেরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভালো ও শ্রেষ্ঠ সময়কালের তাওফীক দানের কারণেই তিনি আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তাদেরকে কল্যাণ তথা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তৃতীয়ত: আর পূর্বোক্ত সামষ্টিক কারণে আমাদেরকে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্মান, তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদেরকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তাদেরকে গালি দেওয়া এবং ঘৃণা বা শত্রুতা করা থেকে এমনকি তিনি তাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ এবং তাদেরকে ঘৃণা বা শত্রুতা করা মুনাফিকীর লক্ষণ বলে মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

চতুর্থত: এসব কিছুর পরেও স্বভাবতই তারা ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং এ জাতির নিরাপদ আশ্রয় আর সেখান থেকেই এ উম্মত কর্তৃক তাদের অনুসরণ করাটা আবশ্যক হয়ে পড়ে; বরং এটাই হলো জন্নাতের একমাত্র পথ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়:

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».

“আমার পরে তোমাদের ওপর আবশ্যক হলো আমার সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা।”[39]

---

[39] আহমদ, ৪/১২৬, ১২৭; তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবন মাজাহ ও দারেমী। আর এক দল মুহাদ্দিস হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। দেখুন: ইবন রজব, জামে'উল 'উলুম ওয়াল

হিকাম, দারুল ফুরকান, প্রথম সংস্করণ, ১৪১১ হি., হাদীস নং ৩৮, পৃষ্ঠা ৩৮৭; আরও দেখুন: আল-ইরওয়াউ, নং (২৫৪৪) ৮/১০৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কোনো কিছুই সাহাবীগণের মর্যাদার সমান নয়

বিজ্ঞ আলেমদের মতে, সাহাবীগণকে সম্মান করা এবং তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জানা একটি স্বীকৃত বিষয় যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ব্যক্তির (সাহাবীর) সাক্ষাতের সময়কাল কম হউক। আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

- হাফেয ইবন হাজার 'আসকালানী রহ. এ বিষয়টির ওপর প্রমাণ উল্লেখপূর্বক বলেন: "সুতরাং এ বিষয়ে প্রমাণ করে আমি লেখক মুহাম্মদ ইবন কুদামা আল-মাররুযীর লিখিত 'আখবারুল খাওয়ারিজ' নামক গ্রন্থে যা পাঠ করেছি। অতঃপর তিনি তার সনদ উল্লেখ করেছেন এ পর্যন্ত যে, তিনি বলেন: নুবাইজ আল-'আনাযী থেকে বর্ণিত, তিনি আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা তার নিকট ছিলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। অতঃপর আলী ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ 'আনহুমা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। অতঃপর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ 'আনহুর পক্ষের এক ব্যক্তি এসে আলোচনায় শামিল হলো। অতঃপর আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ 'আনহু সোজা হয়ে বসে তার সেই কাহিনী বর্ণনা করলেন, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন এবং সাথে ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ 'আনহু ও জনৈক আরব বেদুইন...। আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ 'আনহু বলেন, অতঃপর আমি ঐ বেদুইনকে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ 'আনহুর নিকট নিয়ে আসতে দেখলাম এমতাবস্থায় যে, সে আনসারদেরকে তিরস্কার করল। তখন উমার রাদিয়াল্লাহ 'আনহু তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

«لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفيتكموه ولكن له صحبة من

رسول الله صلى الله عليه وسلم».

“যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার সহচর্য না থাকত, তবে আমি তোমাদেরকে তার জন্য যথেষ্ট মনে করতাম; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার সহচর্য রয়েছে।”[40]

হাফেয ইবন হাজার ‘আসকালানী রহ. বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

সুতরাং উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে শুধু তিরস্কার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। কারণ, তিনি জানতে পেরেছেন যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন আর এ কথার মধ্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, তারা বিশ্বাস করতেন -নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্যের মর্যাদার সমান আর কিছুই হতে পারে না।

- আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওকী‘ রহ., তিনি বলেন: আমি সুফিয়ানকে আল্লাহ তা‘আলার বাণী

﴿قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٰٓۗ﴾ [النمل: ٥٩]

“বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি।”[সূরা আন-নামল, আয়াত: ৫৯]-এর ব্যাপারে বলতে শুনেছি যে, তারা হলেন মুহাম্মদ

---

[40] উমার রাদিয়াল্লাহ ‘আনহুর বক্তব্য ব্যতীত ইমাম আহমদ রহ. হাদীসখানা বর্ণনা করেন, ৩/৫১; আর আলী ইবনুল জা‘য়াদ হাদীসখানা অবিকল শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেন, ২/৯৫৬; হাইছামী (৪/৯২) বলেন: হাদিসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত এবং ইবন হাজার ইয়াকুব ইবন শায়বার বর্ণনার কারণে হাদিসটিকে আযীয বলেছেন, যেমনটি তার থেকে বর্ণিত হাদিসের সনদের মধ্যে দেখা যায়, ১/২০; আর শাইখুল ইসলাম আবু যর আল-হারবীর বর্ণনার কারণে হাদিসটিকে আযীয বলেছেন, আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৯০

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী।[41] এ সূত্রের সংযুক্তি করা হয়েছে 'আল-ইসাবা' নামক গ্রন্থে।[42]

সুতরাং এ নির্বাচন ও বাছাইকরণটি একটি অকল্পনীয় বিষয়, যা অনুধাবন করা যায় না এবং বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা অনুমানও করা যায় না। আর সেখান থেকেই অন্যদের সাথে তাদের মর্যাদার তুলনা করার অবকাশ নেই, তাদের কর্মকাণ্ড যত উচ্চ মানেই পৌঁছায় না কেন।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ 'আনহুমা বলেন:

«لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مع النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أربعين سنة».

"তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে গালি দিও না। কারণ, তাদের কোনো একজনের একটু সময় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থান করার মূল্যমান তোমাদের কোনো একজনের চল্লিশ বছরের আমলের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম।"[43]

আর ওকী' রহ. এর এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহ 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عبادة أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ».

---

[41] তাবারী, আসার, প্রকাশনা: দারুল মা'রেফা, ২০/৩; আরও দেখুন: ইবনু কাছীর, প্রকাশনা: দারুল মা'রেফা, ৩/৩৬৯

[42] আল-ইসাবা, প্রকাশনা: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ইবন আবদিল বাররের 'আল-ইসতি'য়াব' নামক গ্রন্থের হাশিয়াসহ, ১/২০-২২

[43] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা, শরহু লামিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১ (মাকতাবা শামেলা, দ্বিতীয় সংস্করণ)

“তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে গালি দিও না। কারণ, তাদের কোনো একজনের একটু সময় (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে) অবস্থান করার মূল্যমান তোমাদের কোনো একজনের গোটা জীবনের ইবাদতের চেয়েও অনেক বেশি উত্তম।”[44]

আর অধিকাংশ আলেমের মতে, কোনো আমলই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্যের সমতুল্য হতে পারে না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষদর্শী মানে হলো -যিনি তাকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন হিজরত অথবা সাহায্যের মাধ্যমে, তার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন অথবা তার নিকট থেকে প্রাপ্ত শরী‘আতকে আঁকড়ে ধরেছেন এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পরে যাদের আগমন হয়েছে, তাদের কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। কারণ, পূর্ববর্তী ব্যক্তির কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের ওপর তার পরবর্তী কোনো ব্যক্তি আমল করলে সে (পূর্ববর্তী ব্যক্তি) তার সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে। অত্রএব, তাদের ফযীলতের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল।[45]

ইমাম আহমদ রহ. তার আকীদা প্রসঙ্গে বলেন: “সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন নগণ্য সাহাবীর মর্যাদা ঐ যুগের সকল ব্যক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যারা তাকে দেখে নি, যদিও তারা তাদের সকল আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে।”[46]

---

৪৪ ইমাম আহমদ, ফাযায়েলুস সাহাবা: ১/৫৭; ইবন মাজাহ, ১/৩১ (আল-আ‘যামী); ইবন আবি ‘আসেম, ২/৪৮৪; আল-বূসীরী ‘যাওয়ায়েদু ইবনে মাজাহ’ এর মধ্যে (১/২৪) খবরটিকে সহীহ বলেছেন; আল-মাতালেবুল ‘আলীয়া, ৪/১৪৬

৪৫ ফতহুল বারী, ৭/৭

46 আল-লালকায়ী, শরহু উসূলি ই‘তিকাদি আহলিস সুন্নাত, ১/১৬০

ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বলেন: “এক মুহূর্তের জন্য হলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য পাওয়ার মর্যাদার সমতুল্য কোনো আমলই হতে পারে না আর কোনো কিছুর বিনিময়ে তার সমমর্যাদা অর্জন করা সম্ভব নয় এবং ফযীলত বা মর্যাদার বিষয়টি কিয়াসের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় না। এটি হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।”[47]

আর তাদের অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতাও আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে হয়েছে, যিনি অন্তরের খবর জানেন। যেমন তাঁর বাণী:

﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ ﴾ [الفتح: ١٨]

“অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮]

আবার তিনি তাদের তাওবা কবুলকারী:

﴿لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ...﴾ [التوبة: ١١٧]

“আল্লাহ অবশ্যই নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন ...]” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৭]

এবং তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন:

﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا ١٨﴾ [الفتح: ١٨]

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই‘আত গ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন। ফলে তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮]

---

[47] নাওয়াওয়ীর ব্যাখ্যাসহ সহীহ মুসলিম: ১৬/৯৩

তাদের এ প্রতিটি ব্যাপারকে তাঁর সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এ ধরনের তাযকীয়া বা পরিশুদ্ধতা কীভাবে সম্ভব হবে? কিন্তু কোনো কোনো প্রবক্তা[48] বলেন: "কিছু কিছু বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, আমি যা উল্লেখ করেছি, তার বিপরীত প্রমাণ করে। যেমন, আবু ছা'লাবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تأتي أيام للعامل فيهن مثل أجر خمسين، قيل يارسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم».

"এমন কতগুলো দিন আসবে, যেসব দিনে একজন (সৎ) আমলকারী ব্যক্তির জন্য পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ প্রতিদানের ব্যবস্থা করা হবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের থেকে পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে, নাকি তাদের থেকে পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে? জবাবে তিনি বললেন, বরং তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ প্রতিদান পাবে।"[49]

আর অনুরূপভাবে আবু জাম'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح قال: فقال: يا رسول الله! هل أحد خير منا؟ اسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني».

---

[48] যারা এ উক্তি করেছেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইমাম ইবন 'আব্দুল বার। আর উল্লেখিত দলীল তার দলীলসমূহ থেকে শক্তিশালী। আর অধিকাংশ আলেম তার বিপরীত মত পোষণ করেন, যেমন আমরা পূর্বে ইঙ্গিত দিয়েছি।

[49] আবূ দাউদ: ৪৩৪১; তিরমিযী: ২/১৭৭; ইবন মাজাহ: ৪০১৪; ইবনু হিব্বান, (আল-ইহসান), ৩৮৫, আর ১৮৫০ মাওয়ারিদু যামআন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন: হাদীসটি হাসান, গরীব; আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দুপুরের খাবার গ্রহণ করলাম আর আমাদের সাথে আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি (আবু ওবায়দা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের চেয়ে উত্তম কেউ আছে কি? আমরা আপনার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনার সাথে জিহাদ করেছি। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, এমন এক সম্প্রদায় আছে, যারা তোমাদের পরবর্তীতে আসবে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে অথচ তারা আমাকে দেখে নি।”[50]

আর আলেমগণ এ হাদীসসমূহ ও পূর্বোক্ত হাদীসসমূহ একত্রিত বা সমন্বয় করেছেন কয়েকটি কারণে; তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

প্রথম কারণ: للعامل فيهن مثل أجر خمسين “তাতে একজন আমলকারী ব্যক্তির জন্য পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ প্রতিদানের ব্যবস্থা রয়েছে” -হাদীসটি শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে না। কারণ, শুধু কিছু আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি করে দেওয়ার বিষয়টি সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকে আবশ্যক করে না।

দ্বিতীয় কারণ: কখনও কখনও শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যার ওপর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত পাওয়া যায়, যা মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই; কিন্তু সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় সে মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমান হতে পারে না।

তৃতীয় কারণ: অনুরূপভাবে বলা হয়: নিশ্চয় উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি শুধু ঐ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে উভয়ের অংশগ্রহণ সম্ভব। আর তা হলো সকল

---

[50] আহমদ, ৪/১০৬; দারেমী ও তাবারানী, ৪/২২-২৩; হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবীও তার মতো অভিমত ব্যক্ত করেছেন, ৪/৮৫; ইবন হাজার বলেন: তার সনদ হাসান পর্যায়ের; আল-ফাতহ: ৭/৬; দেখুন: আল-ফাতহুর রাব্বানী, ১/১০৩-১০৪

মুমিনের মধ্যে সাধারণ ও সমন্বিত আনুগত্যের বিষয়। সুতরাং তখন এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয়ে কোনো কোনো সাহাবীর ওপর মর্যাদার বিষয়টি বিদূরিত হয় না, তবে সহাবীগণ যা দ্বারা বিশেষিত হয়েছেন এবং সফলতা লাভ করেছেন। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহে দৃশ্য অবলোকন এবং তাঁর পবিত্র সত্তাকে দেখা, তা হলো একটি যুক্তিসংগত বিষয়। কারণ, কারো পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে এমন কোনো মর্যাদাপূর্ণ কাজ করবে, যার দ্বারা সে তাঁর মতো হওয়ার কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছে যাবে।[51]

চতুর্থ কারণ: বর্ণনাকারীগণ আবু জাম'আ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শব্দের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ নন। কারণ, তাদের কেউ কেউ তা বর্ণনা করেছেন الخيرية (সর্বোত্তম) শব্দ দ্বারা, যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আবার তাদের কেউ কেউ তা বর্ণনা করেছেন এরূপ শব্দ দ্বারা:

(قلنا يا رسول الله! هل من قوم أعظم منا أجرا ؟ - أخرجه الطبراني)

“আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সাওয়াব অর্জনের দিক থেকে আমাদের চেয়ে মহান কোনো সম্প্রদায় আছে কি? –তাবরানী হাদীসটি বর্ণনা করেন।”[52]

হাফেয ইবন হাজার 'আসকালানী রহ. 'আল-ফাতহ'-এর মধ্যে বলেন: এ বর্ণনার সনদ পূর্ববর্তী বর্ণনার সনদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর তা আবু ছা'লাবা'র হাদীসের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ। তার জওয়াব পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

পরিশেষে এ শেষ অনুচ্ছেদে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত যে, এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ আলেম ও অন্যান্যদের মধ্যকার বিরোধ খোলাফায়ে রাশেদীন ও বাকি 'আশারা মুবাশ্বারা এবং যাদের ব্যাপারে বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাদের মতো বড়

---

[51] হাইছামী, আস-সাওয়ায়েক আল-মুহার্রিকা, পৃষ্ঠা ৩২১

[৫২] তাবারানী, ৪/২২/২৩

বড় সাহাবীগণকে অন্তর্ভুক্ত করে না। যেমন, 'আকাবার শপথে অংশগ্রহণকারী এবং বদর, তাবুক...ইত্যাদির মতো যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। আর বিতর্কের সূত্রপাত হয় ঐসব সাহাবীগণকে নিয়ে, যাদের শুধু আল্লাহর রাসূলকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আর এ জন্যই ইমাম ইবন 'আবদিল বার বদরের যুদ্ধে ও হুদায়বিয়ার সন্ধির অভিযানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণকে পৃথক করেছেন।[53]

---

৫৩ ফতহুল বারী: ৭/৭

তৃতীয় অধ্যায়: সাহাবীগণকে গালি দেওয়া এবং তার বিধান ও পরিণতি

প্রথম পরিচ্ছেদ: সাহাবীগণকে গালি দেওয়া ও তার বিধান

সাহাবীগণকে গালি দেওয়ার বিষয়টি কয়েক প্রকারে বিভক্ত আর প্রত্যেক প্রকারের গালির জন্য নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

আর গালি হলো এমন কথা বলা, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মর্যাদা হ্রাস করা ও হেয় প্রতিপন্ন করা। গালি থেকে মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে তাদের বিবেক-বুদ্ধি সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। যেমন, অভিশাপ দেওয়া, মন্দগুণে ভূষিত করা ইত্যাদি।[54]

আর সহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে গালি দেওয়া মানে তাদের কাউকে কাউকে নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া। সুতরাং কেউ কাফির বা ফাসিক বলে গালি দেয়, আবার কেউ কৃপণ ও বেআক্কেলের মতো দুনিয়াবী বিষয়ের মাধ্যমে গালি দেয়, আর এ গালি তাদের সকলের উদ্দেশ্যে হতে পারে অথবা তাদের অধিকাংশের উদ্দেশ্যে হতে পারে অথবা তাদের কাউকে কাউকে উদ্দেশ্য করে গালি দেয় অথবা তাদের কোনো এক ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য করে গালি দেয়, আর ঐ ব্যক্তি বিশেষ হন এমন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত, যার মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের কুরআন-সুন্নাহ'র নস বা বক্তব্য রয়েছে অথবা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

আপানাদের সামনে প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বা বিধানের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো:

প্রথমত: যে ব্যক্তি সকল সাহাবীকে অথবা অধিকাংশকে কাফির, মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বা ফাসিক বলে গালি দিবে তার বিধান হলো, যে ব্যক্তি এমন কথা

[54] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৬১

বলবে, সে ব্যক্তি কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, আর এ কাফির হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো:

১. এ কথার অর্থ হলো কুরআন ও সুন্নাহর সংকলনকারীগণ কাফির বা ফাসিক। আর এ কারণে আল-কুরআন ও হাদীসসমূহের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। কারণ, সংকলনকারীদেরকে অপবাদ দেওয়ার অর্থ হলো তাদের দ্বারা সংকলিত বিষয়ে অপবাদ দেওয়া।

২. এর মধ্যে ঐ বিষয়টিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়, যে বিষয়ে কুরআন বক্তব্য পেশ করেছে। যেমন, তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়ার কথা এবং তাদের গুণগান করা। কারণ, ‘আল-কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যসমূহ থেকে অর্জিত জ্ঞান অকাট্যভাবে তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।’[55] আর যে ব্যক্তি আকাট্য দলীলকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যায়।

৩. এর মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার রয়েছে। কারণ, তারা হলেন তার সঙ্গী-সাথী ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং তাঁর বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গালি দেওয়া এবং তাদের প্রতি অপবাদ দেওয়াটা তাকে নিঃসন্দেহে কষ্ট দেয় আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া কুফুরী যা সর্বজন স্বীকৃত।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রহ. এ প্রকার গালির বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাপূর্বক বলেন: “আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করে বলবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে তাদের (সাহাবীগণের) অল্প সংখ্যক ব্যক্তি, যাদের সংখ্যা দশ জনের বেশি হবে না, এমন সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া সকলেই মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে অথবা তারা সকলেই ফাসিক হয়ে

[55] আর-রাদ্দু ‘আলা আর-রাফেদা, পৃষ্ঠা ১৯

গেছে, তবে এ ধরনের কথাও নিঃসন্দেহে তার কুফুরীর মধ্যে পড়ে। কারণ, সে আল-কুরআনের একাধিক জায়গায় প্রদত্ত বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। যেমন, তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়ার কথা এবং তাদের গুণগান করা। বরং যে ব্যক্তি এ ধরনের কুফুরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, তবে তা তার কুফুরী হিসেবে বিবেচিত হবে... তিনি বলেন: দীন ইসলামের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে যা জানা যায়, তা থেকেই এটা কুফুরী বলে গণ্য।”[56]

হাইছামী রহ. বলেন: “অতঃপর আলোচনা বা সমালোচনা তথা বিতর্ক হলো শুধু তাদের কিছু সংখ্যককে গালি দেওয়ার ব্যাপারে, তবে তাদের সকলকে গালি দেওয়া যে নির্ভেজাল কুফুরী তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয় নেই।”[57]

আর পূর্ববর্তী পূর্ণাঙ্গ দলীলসমূহের সুস্পষ্টতা সত্ত্বেও কোনো কোনো আলেম আরও কিছু ব্যাখ্যামূলক দলীলের উল্লেখ করেন, তন্মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নরূপ:

প্রথমত: আমাদের নিকট আলেমদের পক্ষ থেকে সূরা আল-ফাতহ’র শেষ আয়াতের যে তাফসীর উপস্থাপিত হয়েছে:

﴿ مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ ... لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ ... ٢٩ ﴾ [الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল... যাতে তিনি তাদের (মুমিনদের) সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন...।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

ইমাম মালেক রহ. এ আয়াত থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন, যে ব্যক্তি সাহাবীগণকে অবজ্ঞা করে, সে কাফির। কারণ, সাহাবীগণ তাদেরকে ক্রোধান্বিত

---

[56] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮৬, ৫৮৭

[57] হাইছামী, আস-সাওয়ায়েক আল-মুহরিকা, পৃষ্ঠা ৩৭৯

করে। আর যে ব্যক্তিকে সাহাবীগণ রাগান্বিত করে, সে কাফির। আর ইমাম শাফে‘ঈ রহ. ও অন্যান্যরাও তার মতো অভিমত ব্যক্ত করেন।[58]

দ্বিতীয়ত: পূর্বে আলোচিত ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. কর্তৃক সংকলিত আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار».

“আনসারদেরকে ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ আর আনসারদেরকে ঘৃণা করা নিফাকীর লক্ষণ।”[59]

অপর এক বর্ণনায় আছে:

«لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق ... ».

“তাদেরকে শুধু মুমিনরাই ভালোবাসে আর তাদেরকে শুধু মুনাফিকরাই ঘৃণা করে ...।”[60]

আর ইমাম মুসলিম রহ. কর্তৃক বিশুদ্ধ সনদসহ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ».

“আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান স্থাপন করে এমন কোনো লোক আনসারদেরকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করবে না।”[61]

---

[58] আস-সাওয়া‘য়েক আল-মুহরিক্বা, পৃষ্ঠা ৩১৭; তাফসীরে ইবন কাছীর: ৪/২০৪; খাল্লালের ‘আস-সুন্নাহ’ এর মধ্যে খবরটি সনদসহ আছে, পৃষ্ঠা ৪৭৮, নং (৭৬০), বিশ্লেষণ: ড. ‘আতিয়াতুয যাহরানী।

[59] সহীহ বুখারী: ৭/১১৩; সহীহ মুসলিম: ১/৮৫

[60] সহীহ বুখারী: ৭/১১৩; সহীহ মুসলিম: ১/৮৫ (হাদিসটি বারা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত)।

[61] সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: আনসার ও আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমকে ভালোবাসা ঈমান ও তার নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের অবজ্ঞা করাটা নিফাকীর লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত

সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরক গালি দিবে সে তাদের প্রতি আরও বেশি অবজ্ঞা প্রদর্শন করল। সুতরাং তার মুনাফিক হওয়াটা আবশ্যক হয়ে যায়, যে আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে না।[62]

তৃতীয়ত: যা আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত। তিনি ঐ ব্যক্তিকে দোররা দ্বারা আঘাত করেছেন, যে ব্যক্তি তাকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে এই এই ক্ষেত্রে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ।” অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري»

“যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম বলবে, আমরা তার ওপর ঐ শাস্তি প্রয়োগ করব, যে শাস্তি আমরা অপবাদ দানকারীর ওপর প্রয়োগ করে থাকি।”[63]

আর অনুরূপভাবে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«لا يفضلني أحد على أبي بكر و عمر إلا جلدته حد المفتري»

“যে কেউ আমাকে আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করবে, আমি তাকে অপবাদ দানকারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তির মতো

হওয়ার দলীল, হাদীস নং ২৪৪

[62] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮১

[63] ইমাম আহমদ, ফাযায়েলুস সাহাবা: ১/৩০০; ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা আস-সারিমুল মাসলুল এর মধ্যে হাদীসটি বা আছারটিকে সহীহ বলেছেন: পৃষ্ঠা ৫৮৫

বেত্রাঘাত করব।”[64]

সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম দু’জন খলিফা উমার ও আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা যখন ঐ ব্যক্তিকে অপবাদ দানকারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তির মতো বেত্রাঘাত করতেন, যে ব্যক্তি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করত, অথবা যে ব্যক্তি উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’র ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করত। অথচ শুধু একজনকে অন্যের ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করার মধ্যে কোনো প্রকার গালি ও দোষ নেই। সুতরাং জেনে রাখা দরকার, তাদের উভয়ের নিকট গালির শাস্তি এর চেয়ে আরও কত বেশি ভয়ানক হতে পারে![65]

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি তাদের কাউকে গালি দেয়, সে তাদের দীনের ব্যাপারে অপবাদ দেয়

যেমন তাদেরকে কাফির বা ফাসিক বলে অপবাদ দেওয়া, যারা হচ্ছেন এমন সাহাবী, যাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মুতাওয়াতির[66] পর্যায়ের নস বা

---

[64] ইমাম আহমদ, ফাযায়েলুস সাহাবা: ১/৮৩; ইবনু আবি ‘আসিম, ‘আস-সুন্নাহ’: ২/৫৮৫, হেকাম ইবন জাহলের সনদে বর্ণিত, তার সনদটি আবূ ‘ওবায়দা ইবনুল হেকামের দুর্বলতার কারণে দুর্বল। দেখুন: ফাযায়েলুস সাহাবা: ১/৮৩; কিন্তু তার কতিপয় প্রত্যয়নকারী (شواهد) সনদ রয়েছে, তন্মধ্যে ইবন আবি ‘আসিমের মতে একটি হলো ‘আলী থেকে ‘আলকামা -এ সনদে, ‘আস-সুন্নাহ’: ২/৪৮, আলবানী তার সনদকে হাসান বলেছেন, আর আল-লালকায়ী’র (৭/১২৯৫) মতে- অপর সনদটি হলো: ‘আলী থেকে সুওয়াঈদ ইবন গাফালা।

[65] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮৬

[66] কোনো কোনো আলেম এর দ্বারা খলিফাদেরকে নির্দিষ্ট করে থাকেন, আবার কেউ কেউ এর দ্বারা আবূ বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। আর আলেমদের মধ্যে কেউ আছেন এমন, যিনি গালির বিধানের মধ্যে তারতম্য করেন এমন বিবেচনায়, যার

বক্তব্য রয়েছে। যেমন, খলিফাগণ। এ জাতীয় কাউকে কাফির বা ফাসিক বলা বিশুদ্ধ মতে কুফরী। কারণ, এর মাধ্যমে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়।

আবু মুহাম্মদ ইবন আবু ইয়াযিদ রহ. সাহনূন রহ, থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের ব্যাপারে বলবে যে, তারা ভ্রষ্টতা ও কুফুরীর ওপর বিদ্যমান ছিল, সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি তারা ব্যতীত অপরাপর সহাবীদেরকে অনুরূপ গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।"[67]

হিশাম ইবন 'আম্মার রহ. বলেন, "আমি মালেক রহ.-কে বলতে শুনেছি "যে ব্যক্তি আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যাপারে বলেন:

﴿يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثۡلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٧﴾ [النور: ١٧]

"আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনো যাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না কর।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ১৭]

মর্যাদার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'র নস বা বক্তব্য মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে অথবা মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নিত হয় নি, আর সম্ভবত তার পরিসংখ্যান খুবই কাছাকাছি, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আর অনুরূপভাবে কেউ কেউ খোলাফায়ে রাশেদীনের গালিদাতাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করার বিষয়টিকে তাদের প্রতি কুফুরের অভিযোগ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন (অর্থাৎ তাদেরকে কাফির বললেই সে কাফির হবে); আর বাকি সাহাবীদের কাউকে গালি দিলে, তা হবে অপবাদ দেওয়ার শামিল। [অর্থাৎ তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ হবে] (দ্র. মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ আল-ওয়াহাইবী, 'ই'তিকাদু আহলে সুন্নাহ ফিস্ সাহাবা'।

[67] কাযী 'আইয়াদ্ব, আশ-শিফা: বিশ্লেষণ: আলী-বাজাবী, ২/১১০৯

সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতি অপবাদ বা অভিযোগের বাণ নিক্ষেপ করবে, সে ব্যক্তি আল-কুরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিবে, আর যে ব্যক্তি আল-কুরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিবে, তাকে হত্যা করা হবে।”[68]

অপর এক বর্ণনায় ইমাম মালেক রহ.-এর কথা (যে ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যে ব্যক্তি ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হলো: কেন? তখন তিনি বললেন: যে ব্যক্তি তার প্রতি অপবাদ বা অভিযোগের বাণ নিক্ষেপ করবে, সে ব্যক্তি আল-কুরআনের বিপক্ষে অবস্থান নেবে। বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন।

এখানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি দেওয়ার বিধান প্রশ্নে ইমাম মালেক রহ.-এর উদ্দেশ্য হলো কুফুরীর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ। আর ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা’র প্রসঙ্গে তার অবশিষ্ট কথাই তা সুস্পষ্ট করে দেয়। যেমন, তিনি বলেছেন: (যে ব্যক্তি তার প্রতি অপবাদ বা অভিযোগের বাণ নিক্ষেপ করবে, সে ব্যক্তি আল-কুরআনের বিপক্ষে অবস্থান নেবে।) সুতরাং এটা নির্দিষ্ট গালি, যা প্রয়োগকারী কাফির হবে এবং তা সকল গালিকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। আর এটা এ জন্য যে, মালেক রহ. থেকে হত্যা করার কথা বর্ণিত হয়েছে ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে, যে ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে কাফির বলবে।”[69]

হাইছামী রহ. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি দেওয়ার বিধান সম্পর্কে বলেন: হানাফীদের মতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি দেওয়া কুফরী, আর শাফে‘ঈদের মতে, দু’টি দৃষ্টিভঙ্গির কোনো একটিকে গ্রহণ করা। আর

[68] আস-সাওয়া‘য়েক আল-মুহরিক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৪

[69] কাযী ‘আইয়াদ্ব, আশ-শিফা (الشفا), বিশ্লেষণ: আল-বাজাবী, ২/১১০৯

মালেক রহ.-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব হলো, এর দ্বারা বেত্রাঘাত ওয়াজিব হবে। কারণ, তা কুফুরী নয়। তবে হ্যাঁ, কখনও কখনও তিনি তার এ মত থেকে বের হয়ে যান, যেমনটি তার থেকে বর্ণিত হয়েছে খারেজীদের ব্যাপারে, আর তা হলো সে কাফির হয়ে যাবে। সুতরাং তার নিকট মাসআলাটির দু'টি অবস্থা: "সে যদি কাফির না বলে শুধু গালির ওপর সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তিনি তাকে কাফির বলেন নি, তার ব্যতিক্রম হলে, সে কাফির হয়ে যাবে।"[70]

তিনি আরও বলেন: "আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং তার মত যাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন, তাদেরকে কাফির বলার বিধান সম্পর্কে শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারীগণ কোনো কথা বলেন নি। আর তিনি এ ব্যাপারে অকাট্যভাবে কুফুরী বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।"[71]

আল-খুরাশী রহ. বলেন: "যে ব্যক্তি 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে অপবাদের বাণে বিদ্ধ করবে, যা থেকে আল্লাহ তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা দিয়েছেন..., অথবা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে সাহাবী বলে অস্বীকার করবে অথবা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত বিশেষ দশ জনের ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করবে অথবা সকল সাহাবীর ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করবে অথবা প্রসিদ্ধ চারজনকে কাফির বলবে অথবা তাদের একজনকে কাফির বলবে, তবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।"[72]

বাগদাদী রহ. বলেন: "আর তারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেন, যে ব্যক্তি সে দশ জনের কোনো একজনকে কাফির বলে,

---

[70] আস-সাওয়ায়েক আল-মুহরিক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৬

[71] আস-সাওয়া'য়েক আল-মুহরিক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৫

[72] আল-খুরাশী 'আলা মুখতাসারিন খলীল: ৮/৭৪

যাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন, আবার তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রী'র পারস্পরিক বন্ধুত্বের কথা বলেন এবং তারা ঐ ব্যক্তিকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেন যে ব্যক্তি তাদেরকে কাফির বলে অথবা তাদের ব্যক্তি বিশেষকে কাফির বলে।"[73]

আর এ মাসআলাটির মধ্যে খোলামেলা বিতর্ক রয়েছে; সম্ভবত অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বিধানটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর যারা এ পরিস্থিতিতে কাফির না হওয়ার কথা বলেন তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, কবীরা গুনাহ করার কারণে সে ফাসিক। সাহাবীর মর্যাদা ও গালির ধরণ অনুযায়ী সে তিরস্কার ও শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবে।

এর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

হাইছামী রহ. বলেন: "যারা সাহাবীগণের গালিদাতাকে কাফির না হওয়ার কথা বলেন তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তারা ফাসিক।"[74]

ইবনু তাইমিয়্যা রহ. বলেন: "ইবরাহীম নখ'ঈ রহ. বলেন: আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে গালি দেওয়াকে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত বলা হতো। অনুরূপভাবে আবু ইসহাক আস-সাবি'ঈ বলেন: আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে গালি দেওয়াটাকে ঐসব কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ﴾ [النساء: ٣١]

"যদি তোমরা ঐসব কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাক, যার থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩১]

---

[73] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আব্দুল হামিদ, পৃষ্ঠা ৩৬০

[74] আস-সাওয়া'য়েক আল-মুহরিক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৩

আর তাদের গালি দেওয়ার পরিণতি যখন এ পর্যায়ের, তখন তার সর্বনিম্ন বিধান হলো তিরস্কার করা। কারণ, তার বিধান শরী'আত বিধিবদ্ধ করেছে এমন প্রতিটি অপরাধের জন্য, যার বিধানের মধ্যে হদ তথা শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি ও কাফফারার ব্যবস্থা নেই... আর এটি (হদ ও কাফফারা) এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ও তাদের যথার্থ অনুসারী তাবে'ঈগণ থেকে শুরু করে ফিকাহবিদ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে কোনো বিতর্ক আছে বলে আমরা জানি না। সুতরাং তারা সকলেই এ কথার ওপর ঐক্যবদ্ধ যে, উম্মতের উপর আবশ্যক হলো সাহাবীগণের গুণাবলী আলোচনা করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা... এবং যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলবে, তার শাস্তির ব্যবস্থা করা।[75]

আর কাযী 'আইয়াদ্ব বলেন: "তাদের কাউকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, আর আমাদের মাযহাব ও অধিকাংশ আলেমের মাযহাব হলো তাকে তিরস্কার করা হবে, তবে হত্যা করা হবে না।"[76]

আর আব্দুল মালেক ইবন হাবিব বলেন: "শিয়াদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে অবজ্ঞা করা ও তার থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে, তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। আর যদি সে আরও বাড়িয়ে আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকেও অবজ্ঞা করে, তবে তার ওপর কঠোর শাস্তি প্রয়োগ হবে, বারবার তাকে প্রহার করা হবে এবং তাকে দীর্ঘ সময় ধরে কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে, শেষ পর্যন্ত সে সেখানে মারা

---

[75] আল-লালকায়ী, শরহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাত ৮/১২৬২, ১২৬৬; আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৭৮

[76] সহীহ মুসলিম, ইমাম নাওয়াওয়ীর ব্যাখ্যাসহ: ১২/৯৩

যাবে।”[77]

সুতরাং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি দেওয়ার শাস্তি হিসেবে শুধু বেত্রাঘাতের ওপর সীমাবদ্ধ থাকবে না। কারণ, এ বেত্রাঘাত প্রযোজ্য হবে শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য পাওয়ার অধিকারের জন্য। সুতরাং যখন সহচর্যের সাথে অন্য আরও এমন কোনো গুণাবলী যুক্ত হয়, যা অতিরিক্ত সম্মান পাওয়ার দাবি করে; যেমন, দীন ও মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে সাহায্য করা, তার হাতে কোনো বিজয় অর্জন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিলাফত পাওয়া ইত্যাদি, তবে এসব বিষয়ের প্রত্যেকটি বিষয়ই তার ওপর কোনো ব্যক্তির স্পর্ধা দেখানোর সময় আবশ্যকীয়ভাবেই অতিরিক্ত শাস্তি দাবি করবে।[78]

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, “তাদের মন্দ দিকের কোনো কিছু আলোচনা-সমালোচনা করা এবং তাদের কাউকে দোষারোপ করা কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া প্রশাসকের ওপর আবশ্যক হয়ে পড়বে, তাকে ক্ষমা করার অধিকার তার (প্রশাসকের) নেই; বরং তিনি তাকে শাস্তি দিবেন এবং তাকে তাওবা করতে বলবেন। অতঃপর সে যদি তাওবা করে, তবে তিনি তা গ্রহণ করবেন। আর যদি সে তার কথায় অটল থাকে, তবে তাকে পুনরায় শাস্তি দিবেন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিবেন, শেষ পর্যন্ত সে সেখানে মারা যাবে অথবা সংশোধন হয়ে ফিরে আসবে।”[79]

সুতরাং মুসলিম ভাই আমার! যে ব্যক্তি তাদের কাউকে দোষারোপ করে অথবা

---

[77] কাযী ‘আইয়াদ্ব, আশ-শিফা, বিশ্লেষণ: আলী আল-বাজাবী, ২/১১০৯; আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৬৯

[78] আস-সাওয়্যয়েক আল-মুহরিক্কা, পৃষ্ঠা ৩৮৭

[79] ত্ববকাতুল হানাবেলা, ১/২৪; আস-সারিমুল মাসলুল পৃষ্ঠা ৫৬৮

কাউকে নিন্দা করে, সে ব্যক্তির ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামের কথার প্রতি লক্ষ্য করুন, আরও লক্ষ্য করুন আবশ্যকীয়ভাবে তার ওপর শাস্তির বিধানের প্রতি। আর যখন কোনো কোনো ইমামের নিকট তাদেরকে উল্লিখিত গালি দেওয়াটা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে গালিদাতার হুকুম হবে কুফুরীর মতো অপরাধকে বৈধ বিবেচনাকারীর মতো কবীরা গুনাহ করা ব্যক্তির হুকুমের মতো।

ইমাম মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল ওহহাব রহ. সাহাবীগণকে গালি দেওয়া বৈধ মনে করার বিধান স্পষ্ট করে বলেন: "আর যে ব্যক্তি তাদের কিছু সংখ্যককে গালির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে অতঃপর তিনি যদি এমন সাহাবী হন, যার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মুতাওয়াতির বর্ণনা রয়েছে। যেমন, খলিফাগণ। এমতাবস্থায় গালিদাতা যদি বিশ্বাস করে যে, তাকে গালি দেওয়ার অধিকার তার রয়েছে অথবা সে গালি দেওয়াটাকে বৈধ মনে করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত আছে তাকে (সাহাবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে, মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফির বলে গণ্য হবে। আর সে যদি তাকে গালি দেওয়ার অধিকার তার রয়েছে বলে মনে না করে তাকে গালি দেয় অথবা গালি দেওয়াটাকে বৈধ মনে না করে, তবে সে ফাসিক হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেওয়াটা ফাসেকী বা অন্যায়। কোনো কোনো আলেম ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কাফির বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ব্যক্তি শায়খাইন তথা আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে সাধারণভাবে যে কোনো প্রকার গালি প্রদান করে।"[80]

যে ব্যক্তি তাদের কাউকে গালি দেয়, তার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলোচনার সারকথা

---

[80] আর-রাদ্দু 'আলার-রাফেদা, পৃষ্ঠা ১৯

হলো, সে তার দীন ও ন্যায়পরায়ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করল, আর তিনি যদি এমন সাহাবী হন, যার মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে, তবে সে (অভিযোগকারী) মুতাওয়াতির পর্যায়ের বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতের ভিত্তিতে কাফির হয়ে যাবে। তবে যাকে আলেমগণ কাফির বলে আখ্যায়িত করেন নি, তার ব্যাপারে তাদের ঐক্যবদ্ধ মতো হলো -সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত একজন এবং সে তিরস্কার ও শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবে। আর ইমামের জন্য তাকে ক্ষমা করা বৈধ হবে না। আর সাহাবীর মর্যাদার অবস্থান অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। আর তাদের মতে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফির হবে না, যতক্ষণ না সে তাদেরকে গালি দেওয়াটাকে বৈধ মনে করবে। তবে যে ব্যক্তি গালি দেওয়াটাকে বৈধ মনে করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে। যেমন, গালি দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হবে মনে করবে, তাহলে সে এমন পর্যায়ের কাফির হবে, যে ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্য সুস্পষ্ট।

আল্লাহ চাহে তো এ প্রকারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার পরবর্তী প্রত্যেকটি প্রকার খুব সহজেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এ জন্যই আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘায়িত করেছি।

তৃতীয়ত: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে গালি দেওয়ার বিধান:

যে ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে এমন বিষয় দ্বারা গালি দিবে যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন, সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিজ্ঞজন তথা আলেমদের ঐক্যবদ্ধ মতামত হলো, সে কাফির হয়ে যাবে।

কাযী আবু ইয়া'লা রহ. বলেন: "যে ব্যক্তি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে এমন

বিষয়ে অপবাদ দিবে যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন, সে ব্যক্তি কোনো প্রকার বিতর্ক ছাড়াই কাফির হয়ে যাবে।" আর এ ব্যাপারে একাধিক ইজমা সংঘটিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। একাধিক ইমাম এ হুকুম বা বিধানটিকে সুস্পষ্ট করেছেন। ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হবে, আর যে ব্যক্তি 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হলো, কেন? তখন তিনি বললেন: যে ব্যক্তি তার প্রতি অপবাদ বা অভিযোগের বাণ নিক্ষেপ করল, সে ব্যক্তি আল-কুরআনের বিরোধিতা করল।"[81]

আর ইবনু শা'বান রহ. তার এক বর্ণনায় বলেন, মালেক রহ. থেকে তা বর্ণিত আছে, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثۡلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٧﴾ [النور: ١٧]

"আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি মুমিন হও, তবে কখনো যাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না কর।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ১৭]

সুতরাং যে ব্যক্তি অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।[82]

যে ব্যক্তি 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে অপবাদ দিবে, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রদত্ত দলীলসমূহ সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত। তন্মধ্যে কয়েকটি:

১. প্রথমত: ইমাম মালেক রহ. যার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এর মধ্যে আল-কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যে

---

[81] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৬৫, ৫৬৬, আর খবরটি সনদসহ আল-মুহাল্লা (المحلى)-এর মধ্যে রয়েছে: ১১/৪১৪, ৪১৫

[৮২] কাযী 'আইয়াদ্ব, আশ-শিফা, বিশ্লেষণ: আল-বাজাবী, ২/১১০৯

কুরআন তাঁর নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে। আর আল-কুরআন যা নিয়ে এসেছে, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কুফুরী।

ইমাম ইবনু কাছীর রহ. বলেন: "আলেমগণ ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন, যে ব্যক্তি এর পরেও তাকে গালি দিবে এবং এই আয়াতের মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার পরেও তাকে এর দ্বারা অপবাদ দিবে, যার দ্বারা তাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, সে আল-কুরআন বিরোধী।"[83]

ইবন হাযম রহ. ইমাম মালেক রহ.-এর পূর্বের কথার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "এখানে ইমাম মালেক রহ.-এর কথা সহীহ। আর তা হলো আয়াতকে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাকে (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে) অকাট্যভাবে নির্দোষ ঘোষণা করার ক্ষেত্রে আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।"[84]

২. দ্বিতীয়ত: এর মাধ্যমে বিভিন্ন কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া ও তাঁর মানহানির বিষয় রয়েছে, যে ব্যাপারে আল-কুরআনুল কারীম প্রমাণ পেশ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা আল্লাহ তা'আলার বাণী:

---

৮৩ দেখুন, তাফসীরু ইবন কাছীর: ৩/২৭৬; আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣﴾ [النور: ٢٣]

"যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা-উদাস, ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা তো দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৩]-এর ব্যাখ্যায়।

84 আল-মুহাল্লা (المحلى): ১১/৪১৫

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤﴾ [النور: ٤]

"আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি কশাঘাত কর এবং তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই তো ফাসিক।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩] এবং তাঁর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣﴾ [النور: ٢٣]

"যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা-উদাস, ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা তো দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৩]-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সুতরাং তিনি দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় বলেন: এ আয়াতটি বিশেষ করে 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের শানে অবতীর্ণ। আর তাতে তাওবার বিষয় নেই। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিন নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তার বক্তব্যের শেষের দিকে তাওবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, সুতরাং ব্যক্তি আপেক্ষিভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে, অতঃপর সর্বোত্তম ব্যাখ্যাটি মাথা পেতে গ্রহণ করবে।"[85]

সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ব্যক্তি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও মুমিন জননীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে। কারণ, তাদের

---

[৮৫] দেখুন: ইবনু জারীর, ১৮/৮৩; আর তার থেকে ইবন কাছীর, ৩/২৭৭

প্রতি অপবাদ আরোপ করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অপবাদ ও দোষারোপের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা, নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, যেমনিভাবে তা তার ছেলে-সন্তানকে কষ্ট দেয়। কারণ, তা তাকে দাইউছের[86] সাথে সম্পর্কিত করে এবং তার দাম্পত্য জীবনে বিশৃঙ্খলার প্রকাশ ঘটায়। আর নিশ্চয় তার স্ত্রীর ব্যভিচার তাকে ভীষন কষ্ট দেয়... এবং সম্ভবত কোনো কোনো মানুষের সাথে তার পরিবারের প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে যে লজ্জা ও অসম্মান সম্পৃক্ত হয়, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাস্তবে অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য।[87] সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে কুফুরী।

ইমাম কুরতুবী রহ. আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثۡلِهِۦٓ أَبَدًا﴾ [النور: ١٧]

“আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, কখনো যাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না কর।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ১৭] প্রসঙ্গে বলেছেন: এ আয়াতটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (অর্থাৎ তার ব্যাপারে যাতে তোমরা অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না কর) কারণ, অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি বলতে যার সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, তার সম্পর্কে অবিকল সে কথার মতো পুনরায় কথা বলাকেই বুঝায় অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্য থেকে যিনি তার মর্যাদায় ছিলেন, তার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মানসম্মান ও পরিবারকে নিয়ে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি

---

৮৬ দাইউছ (ديوث) হল: স্ত্রীর ব্যভিচারে নির্লিপ্ত স্বামী।

৮৭ আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৪৫; কুরতুবী: ১২/১৩৯, মুদ্রণ: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা।

এমন কাজ করবে, এটা তার পক্ষ থেকে কুফুরী বলে গণ্য হবে।[88]

আর যা প্রমাণ করে যে, তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের কারণ, তা ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে ইফকের ঘটনা সংবলিত হাদীসে বর্ণনা করেছেন। 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« ... فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ... ».

"...অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন, অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুলের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বললেন: 'হে মুসলিম সমাজ! আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে লোক আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে?..."[89]

সুতরাং তার কথা: (مَنْ يَعْذِرُنِي) অর্থাৎ যখন আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি আমাকে জ্বালাতন করেছে, আর আমি তার থেকে প্রতিকার চাই, তখন কে আমার প্রতি ইনসাফ করবে এবং তার প্রতিকার করবে। আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

---

৮৮ কুরতুবী: ২/১৩৬, ২৩৭; ইবনুল 'আরাবী থেকে বর্ণিত, আহকামুল কুরআন: ৩/১৩৫৫, ১৩৫৬, বিশ্লেষণ: বুখারী।

89 সহীহ বুখারী, শাহাদাত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: এক মহিলা অপর মহিলার সততা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান, হাদীস নং ২৫১৮; সহীহ মুসলিম, তাওবা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ইফকের ঘটনা ও অপবাদ দানকারীর তাওবা কবুল প্রসঙ্গে, হাদিস নং-৭১৯৬

সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা খুবই কষ্ট পেয়েছেন এবং তার ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। আর যেসব মুমিন উত্তেজিত হয় নি, তারা বললেন: আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিন, আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিব। সুতরাং আমরা আপনাকে অপবাদ থেকে মুক্ত করব, যখন আপনি আমাদেরকে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিবেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দের কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি, যখন সে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ চেয়েছেন।[90]

শাইখ মুহাম্মদ ইবন আবদিল ওয়্হাব রহ. বলেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে পবিত্রতমা (যা তার থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত) উম্মুল মুমিনীন জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, তবে সে হবে মুনাফিকদের প্রধান আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুলের কাতারের লোক। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলার ভাষা হলো: 'মুসলিম সমাজ! আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে লোক আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে? আল-কুরআনের ভাষায়:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ٥٧ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٥٨﴾ [الاحزاب: ٥٧، ٥٨]

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক

[90] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯ সংক্ষেপ করার মাধ্যমে উদ্ধৃত।

শাস্তি। আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, যা তারা করে নি তার জন্য। নিশ্চয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৭-৫৮]

সুতরাং কোথায় তাঁর দীনের সাহায্যকারীগণ, যারা তাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে অপবাদ থেকে মুক্ত করব।”[91]

যেমনিভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করার মধ্যে অপর দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাহানির বিষয় রয়েছে, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ ...﴾ [النور: ٢٦]

“দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য ...।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৬]

ইবন কাছীর রহ. বলেন: “আল্লাহ তা‘আলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে পবিত্র অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী বানিয়েছেন। কারণ, তিনি হলেন পবিত্র মানুষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পবিত্রতম, আর তিনি (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) যদি দুশ্চরিত্রা নারী হতেন (না‘উযুবিল্লাহ), তবে তিনি শর‘ঈ ও মর্যাদার দিক বিবেচনায় তাঁর (রাসূলের) জন্য উপযুক্ত হতেন না। আর এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَۖ ﴾ [النور: ٢٦]

“লোকেরা যা বলে তার সাথে তারা সম্পর্কহীন।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৬] অর্থাৎ মিথ্যাবাদী ও সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী যা বলে, তারা তার থেকে সমপূর্ণ

---

[91] রিসালাতুন ফির রদ্দি ‘আলার রাফিযা: ২৫, ২৬

মুক্ত ও পবিত্র।”[92]

চতুর্থত: অবশিষ্ট মুমিন জননীদেরকে গালি দেওয়ার বিধান:

অবশিষ্ট মুমিন জননীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করার বিধানের ক্ষেত্র আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তবে অধিকাংশের নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হলো এ ধরনের আচরণকারী কাফির। কারণ, অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আর আল্লাহ তা'আলা তার (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) জন্য রাগান্বিত হয়েছেন। কেননা তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। সুতরাং তিনি (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) এবং তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণ সকলেই আইনের চোখে সমান।[93]

অনুরূপভাবে আরেকটি কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মধ্যে তাঁর জন্য মর্যাদাহানি ও কষ্টের কারণ নিহিত রয়েছে।[94] যার বর্ণনা আমরা করেছি 'যে ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, তার বিধান আলোচনা করার সময়।' তবে এ অপবাদ ব্যতীত মুমিন জননীদেরকে গালি দিলে, তখন তাদের বিধান হবে অপরাপর সাহাবীগণকে গালি দেওয়ার বিধানের মতো, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

পঞ্চমত: যে সাহাবীর মর্যাদা মুতাওয়াতির বর্ণনার দ্বারা সাব্যস্ত হয় নি, তাকে এমন গালি দেওয়া, যা তাঁর দীনে আঘাত করে:

যে ব্যক্তি এমন কোনো সাহাবীকে গালি দেয়, দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে যার মর্যাদার

---

[92] ইবন কাছীর: ৩/২৭৮

[93] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৯৫

[94] কাযী 'আইয়াদ্ব, আশ-শিফা, বিশ্লেষণ: আল-বাজাবী, ২/১১০৯; আরও দেখুন: আস-সাওয়ায়েক আল-মুহরিক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৭; আল-মুহাল্লা: ১১/৪১৫

ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে, সে গালিদাতাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতামতটি আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। তবে যার মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা আসে নি, তাকে যে ব্যক্তি গালি দিবে, অধিকাংশ আলেমের মতে সে কাফির হবে না। আর এটা এ জন্য যে, তার দ্বারা দীনের আবশ্যকীয়ভাবে জ্ঞাত কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা হয় না, তবে তাকে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তথা সহচর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে গালি দেওয়া হয়, তবে গালিদাতা কাফির হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল ওহ্হাব রহ. বলেছেন: "যদি তিনি এমন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হন, যার মর্যাদা ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা আসে নি, তাহলে পরিষ্কাভাবে ঐ সাহাবীকে গালিদাতা ফাসিক বলে গণ্য হবে, তবে তাকে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সহচর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে গালি দেওয়া হয়, তবে গালিদাতা কাফির হয়ে যাবে।"[95]

ষষ্ঠত: তাদের কাউকে এমন গালি দেওয়া, যা তাদের দীন ও ন্যায়পরায়ণতায় আঘাত করে না:

কোনো সন্দেহ নেই যে, এমন কাজ যে করবে, সে তিরস্কার ও শাস্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আমরা অধ্যয়ন বা অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই, উল্লিখিত তথ্যপঞ্জিতে আলেমদের উক্তিসমূহতে আমরা তাদের মধ্য থেকে একজনকেও এরূপ গালিদাতাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করতে দেখি নি আর এ ব্যাপারে তাদের মতে সাহাবীগণের মধ্যে বড় বা ছোট বলে কোনো পার্থক্য নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা রহ. বলেন: "তবে যদি সে তাদেরকে এমন গালি দেয়, যা তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও দীনকে কলুষিত করে না। যেমন,

[95] আর-রাদ্দু 'আলা আর-রাফেদা, পৃষ্ঠা ১৯

তাদের কাউকে কৃপণ বলা অথবা কাপুরুষ বলা অথবা অল্প বিদ্যান বলে আখ্যায়িত করা অথবা দুনিয়াদার বলে সম্বোধন করা ইত্যাদি, তবে সে তিরস্কার ও শাস্তির অধিকারী হবে। আর শুধু এ কারণে আমরা তাকে কাফির বলে ফতোয়া দিব না। আর এ যুক্তির ওপর নির্ভর করছে ঐ ব্যক্তির কথা, আলেমদের মধ্য থেকে যিনি তাকে (এ কারণে) কাফির বলে আখ্যায়িত করেন না।”[96]

আবু ই‘য়ালা রহ. কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন, যাতে রাজনৈতিক কারণে তাদেরকে স্বল্প জ্ঞানের দোষে দোষারোপ করা হয়েছে।[97]

আর অনুরূপ বিধানই প্রযোজ্য হবে তার প্রতি যে তাদেরকে দুর্বল সিদ্ধান্ত, দুর্বল ব্যক্তিত্ব, অলসতা, দুনিয়ালোভী ইত্যাদি দোষে দোষারোপ করবে। বস্তুত এ প্রকারের অপবাদ দ্বারা ইতিহাসের কিতাবগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে আহলে সুন্নাতের সাথে সম্পর্কিত সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীলতা ও পাঠ পদ্ধতির নামে এসব অপবাদে ভরপুর হয়ে আছে। মূলত এ প্রকারের অধিকাংশ শিক্ষায় প্রাচ্যবিদদের একটা প্রভাব রয়েছে।

---

[96] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮৬

[97] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৭১

সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ

আশা করা যায় এখানে খুবই সংক্ষিপ্ত একটি অনুচ্ছেদের অবতারণা করাটা যথাযথ হবে, তাতে আমরা এ পদ্ধতির ভুল-ভ্রান্তিগুলো বর্ণনা করব। আরও তুলে ধরব সাহাবীগণের ইতিহাসের সাথে তার সমন্বয়সাধনের ভয়ঙ্কর দিকগুলো।

পাশ্চাত্যবিদগণের নিকট সৃজনশীল পদ্ধতি মানে বিষয়বস্তু নিয়ে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে সরে গিয়ে শুধু বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণা করা।[98]

সুতরাং আমরা এর জবাবস্বরূপ বলব:

প্রথমত: মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতেই তার আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়, তবে সে তার বিশ্বাসকে অস্বীকার করলেই তা সম্ভব হবে।[99]

দ্বিতীয়ত: ইসলামের ইতিহাসের ব্যাপারটিও অনুরূপ, যখন ঘটনাসমূহ সাব্যস্ত হবে বর্ণনা সমীক্ষার মানদণ্ডে, তখন আমরা কোন পদ্ধতিতে তা অনুধাবন করব এবং ব্যাখ্যা করব? যখন আমরা ইসলামী পদ্ধতিতে তা ব্যাখ্যা করব না, তখন অবশ্যই আমরা অপর একটি পদ্ধতি পছন্দ করব। ফলে আমরা এমনভাবে বিকৃতির মধ্যে পতিত হব যে, আমরা জানতেই পারব না।

সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে আমাদের আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো, আমরা সাহাবীগণের ইতিহাসের সাথে এ পদ্ধতিটির সমন্বয়সাধনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করব। আর যার মাধ্যমে আমি আমার নিজেকে এবং আমার গবেষক ভাইদেরকে সাহাবীগণের ইতিহাসের ব্যাপারে যে উপদেশ দিচ্ছি তা হলো, তারা

---

[98] দেখুন: ‘উলইয়ানী, মানহাজু কিতাবাতুত তারীখ, পৃষ্ঠা ১৩৮

[99] এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: ডক্টর মুহাম্মদ রাশাদ খলিল, ‘ফীর রাদ্দে ‘আলা দা‘ওয়াল মাওদু‘য়ীইয়্যা’: ৩৪-৩৭

যেন তাদের আকীদা-বিশ্বাস থেকে দূরে সরে না যায়। আর সে আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে অন্যতম দিক হলো সাহাবীগণের ‘আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আস্থা পোষণ করা, তাদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ও আলোচনার সময় তাদেরকে গালি দেওয়া হারাম মনে করা, তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা; যেহেতু তাদের মাধ্যমে ইসলাম এসেছে। আর তাদের জেনে রাখা উচিত, নিশ্চয়ই ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আহলে সুন্নাতের একটি স্পষ্ট পদ্ধতি রয়েছে, যে ব্যাপারে শেষের দিকে একটি বিশেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সহাবীগণকে গালি দেওয়ার অপরিহার্য পরিণতি

সালাফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী নেক বান্দাগণ সাহাবীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ এবং তাদেরকে গালি দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন এবং অপবাদদানকারী ও তাদের উদ্দেশ্য থেকে সতর্ক করেছেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে এ গালি দীনের মূলনীতিকে যে অপরিহার্য অসঙ্গতির দিকে ধাবিত করবে, সে সম্পর্কে তাদের জানা থাকার কারণে। সুতরাং তাদের কেউ কেউ কম কথা বলেছেন; কিন্তু সে কথাগুলো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, সে কথাগুলো এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করব। অতঃপর কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করব যা সচরাচর গালির সাথে সম্পৃক্ত।

সকল সাহাবী অথবা তাদের অধিকাংশকে কুফুরী বা ফাসেকীর সাথে সম্পর্কিত করে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের গালি দান অথবা খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো কোনো সাহাবী, যার মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে, তার ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রদত্ত অপবাদের যুক্তি খণ্ডন প্রসঙ্গে প্রদত্ত বক্তব্যগুলো এখানে একত্রিত করব।

ইমাম মালেক রহ. যেসব ব্যক্তি সাহাবীগণকে গালি দেয়, তাদের সম্পর্কে বলেন, “তারা এমন সম্প্রদায়, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের মধ্যে কালিমা লেপন করতে চেয়েছে; কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হয় নি। অতঃপর তারা তাঁর সাহাবীগণের ব্যাপারে দূর্নাম করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মন্দ ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছে, তারা চায় এটা বলতে যে, সে যদি সৎব্যক্তি হত, তবে তাঁর সাহাবীগণও সৎ হতেন।”[100] [না‘উযুবিল্লাহ]

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, “যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে সাহাবীগণের মধ্য

---

[100] ‘সাহাবীদেরকে গালি দেওয়ার বিধান’ প্রসঙ্গে পুস্তিকা, পৃষ্ঠা ৪৬; আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮০ থেকে সংকলিত।

থেকে কারও ব্যাপারে মন্দ সমালোচনা করতে দেখবে, তখন তুমি তাকে সন্দেহ করবে যে, সে মুসলিম কিনা।”[101]

আবু যুর‘আ আর-রাযী রহ. বলেন, “যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে কারও মর্যাদাহানি করতে দেখবে তখন তুমি জেনে রাখবে যে, সে হলো নাস্তিক আর এটা এ জন্য যে, আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য এবং আল-কুরআন সত্য; আর এ কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে (শ্রেষ্ঠ মানুষ) হিসেবে পরিচিতি দান করেছে। আর তারা চাচ্ছে আমাদের সাক্ষীদেরকে (সাহাবীগণকে) বিতর্কিত করতে, যাতে তারা কুরআন ও সুন্নাহকে বাতিল করতে পারে। আর এ লক্ষ্যে তাদের জন্য উত্তম কৌশল হলো দূর্নাম রটনার মাধ্যমে তাদেরকে বিতর্কিত করা। সুতরাং তারা হলো নাস্তিক।”[102]

আর ইমাম আবু না‘ঈম রহ. বলেন, “সুতরাং কেউ যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তির পিছনে না লাগে; বরং সে যেন তাদের পক্ষ থেকে রাগান্বিত অবস্থায় মনের অজান্তে তাঁর দীনের ব্যাপারে মন্দ কিছু হয়ে থাকলে, সে ব্যাপারে তাদেরকে হিফাযত করে।”[103]

তিনি আরও বলেন, “যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে তাদের ব্যাপারে মন্দ উদ্দেশ্যে

---

[101] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৪২; আরও দেখুন: আল-মাসায়েল ওয়ার রাসায়েল, যাতে ইমাম আহমাদের আকীদা বিষয়ক বর্ণনা জমা করা হয়েছে। মুদ্রণ: দারু তায়্যিবা, ২/৩৬৩, ৩৬৪

[102] খতিব আল-বাগদাদী, আল-কিফায়া, পৃষ্ঠা ৯৭

[103] আবু না‘ঈম, ইমামত, পৃষ্ঠা ৩৪৪

সম্প্রসারিত করবে, আমি তার জিহ্বাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ, ইসলাম ও মুসলিমগণ থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেব।”[104]

এখানে আলেমদের সতর্ককরণের বিষয়টি ব্যাপক, যা সকল সাহাবীকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর চিন্তা করুন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের কথা, “...সাহাবীগণের মধ্যে কোনো একজনের ব্যাপারে মন্দ সমালোচনা করবে...” এবং আবু যুর‘আ-এর কথা: “...আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কারও মর্যাদাহানি করতে দেখবে...”। সুতরাং তারা সতর্ক করেছেন শুধুমাত্র মর্যাদাহানিকরণ অথবা মন্দ সমালোচনা করা থেকে। যা গালি অথবা কাফির বলার চেয়ে নিম্নমানের অপরাধ। আর এ কথাগুলো ইমামগণ বলেছেন সাহাবীগণের মধ্য থেকে কোনো একজনের ব্যাপারে যে কেউ এ ধরণের কাজ করবে তার ব্যাপারে, সকল সাহাবীর ব্যাপারে নয়। সুতরাং তাকে কী বলা হবে, যে ব্যক্তি তাদের অধিকাংশকে গালি দেয়?

গালির অপরিহার্য পরিণতির কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা আমার পাঠক ভাইয়ের সামনে পেশ করা হলো:

প্রথমত: সাহাবীগণকে গালিদানকারীর কথার ওপর ভিত্তি করে অল্প সংখ্যক সাহাবী ব্যতীত অধিকাংশ সাহাবী কাফির, মুরতাদ বা ফাসিক হয়ে যাওয়াটা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আরও আবশ্যক হয়ে পড়ে আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববীর মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া। আর এটি এ জন্য যে, সংকলনকারীগণ অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে, সংকলিত বিষয় বা বস্তুও সে অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, কীভাবে আমরা এমন একটি

[104] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৬

কিতাবের ওপর আস্থা রাখব, যে কিতাবটি আমাদের পর্যন্ত বহন করে নিয়ে এসেছে ফাসিক ও মুরতাদগণ (না'উযুবিল্লাহ)। আর এ জন্যই সাহাবীগণকে গালি দানকারী কিছুসংখ্যক পথভ্রষ্ট ও বিদ'আতের অনুসারী ব্যক্তিবর্গ স্পষ্ট করে বলে যে, সাহাবীগণ আল-কুরআনকে বিকৃত করেছেন এবং তাদের কেউ কেউ এটাকে গোপন করেছেন। আর তাদের দাবী অনুযায়ী হাদীসে নববীর বেলায়ও অনুরূপটি সংঘটিত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে; কারণ যখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে তাদের 'আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে দোষারোপ করা হয়, তখন সনদসমূহ মুরসাল বা মাকতু' হয়ে যায়, যা সে ব্যাপারে দলীল হতে পারে না। এ সত্ত্বেও তাদের কেউ কেউ আল-কুরআনের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের কথা বলে। অতএব, আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলব: আল-কুরআনের প্রতি ঈমান থেকে আবশ্যক হয়ে পড়ে তার মধ্যে যা কিছু আছে তার প্রতি ঈমান স্থাপন করা। আর আমরা জানি যে, তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা হলো: সাহাবীগণ হলেন শ্রেষ্ঠ উম্মত বা জাতি, আল্লাহ তাদেরকে অপমানিত করবেন না এবং তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে এ তথ্যকে সত্য বলে স্বীকার করবে না, সে ব্যক্তি আল-কুরআনের মধ্যে যা কিছু আছে তাতে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং তার প্রতি বিশ্বাস লঙ্ঘনকারী।

দ্বিতীয়ত: গালি দানকারীদের এ কথা দাবি করে যে, নিশ্চয় এ জাতি হলো (না'উযুবিল্লাহ) নিকৃষ্ট জাতি, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণে প্রেরণ করা হয়েছে; আর এ জাতির পূর্ববর্তীগণ হলো জাতির নিকৃষ্ট সন্তান। আর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হলো প্রথম শতাব্দীর প্রজন্ম, তাদের সকলেই ছিল কাফির অথবা

ফাসিক এবং নিশ্চয়ই তারা হলো সকল শতাব্দীর নিকৃষ্ট ব্যক্তি।[105]

তাদের মুখ থেকে কত জঘন্য কথা বের হয়, এরা তো শুধু মিথ্যাই বলে।

তৃতীয়ত: এ কথা থেকে দু’টি বিষয়ের কোনো একটি আবশ্যক হয়: তাদের কথা থেকে হয় আল্লাহ তা‘আলার সাথে মূর্খতার সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়, অথবা (আল-কুরআনের) এসব বক্তব্যে তিনি সাহাবীগণের ব্যাপারে যে প্রশংসা ও গুণগান করেছেন, তা নিরর্থক হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা যদি তাদের কথা না জেনে থাকেন যে, তারা অচিরেই কাফির হয়ে যাবে এবং তা সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রশংসা ও গুণগান করেছেন এবং তাদেরকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দান করেছেন, তবে তা হলো এক ধরনের মূর্খতা আর আল্লাহ তা‘আলার ওপর মূর্খতার অভিযোগ আনা অসম্ভব। অন্যদিকে আল্লাহ তা‘আলা যদি জানেন যে, তারা অচিরেই কাফির হয়ে যাবে, তবে তাদের জন্য তাঁর উত্তম প্রতিশ্রুতি এবং তাদের ওপর তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো অর্থই হয় না। আর আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নিরর্থক কোনো কাজ হওয়া একেবারেই অসম্ভব।[106]

তাছাড়া এ অপবাদ বা অভিযোগ আল্লাহ তা‘আলার হিকমত বা কর্মকৌশলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যেমন তিনি তাদেরকে পছন্দ ও বাছাই করেছেন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্যের জন্য। অতঃপর তারা তাঁর সাথে জিহাদ করেছেন, তাকে শক্তি যুগিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন, আর তিনি তাদেরকে তাঁর আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এমনকি তিনি তাঁর দুই কন্যাকে যূন-নূরাইন উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার কন্যাদ্বয়কে বিয়ে করেছেন।

---

[105] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮৭

[106] দেখুন: মুহাম্মদ ইবনুল ‘আরাবী আত-তাবানী, ইত্তিহাফু যবিউন নাজাবা, দারুল আনসার, পৃষ্ঠা ৭৫

সুতরাং তারা অচিরেই কাফির হয়ে যাবে (যেমনটি অপবাদ দানকারীরা বলে থাকে) -এ কথা তাঁর জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি কীভাবে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাদেরকে সাহায্যকারী ও আত্মীয়-স্বজন হিসেবে মনোনীত করেছেন?

চতুর্থত: সাহাবীগণকে প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহে চরিত্রে, ত্যাগ-তিতিক্ষায়, তপস্যায় এবং তাকওয়া বা ধার্মিকতায় একটি আদর্শ সমাজ গঠিত হয়েছে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বা প্রশিক্ষক। কিন্তু (গালির অপরিহার্য পরিণতি) অবস্থাকে তার বিপরীত করে দেয়। কারণ, যে জামা'আতটি ইসলাম ও ইসলামের নবীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি করে, তারা এ সমাজের জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত একটা রূপরেখা পেশ করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ময়দানে যেসব চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট স্বীকার করেছেন, তা ধ্বংস করে এবং তাঁর ওপর ব্যর্থতার এমন অভিযোগ চাপিয়ে দেয়, যা নিয়ে কোনো সংস্কারক বা প্রশিক্ষক তাঁর মুখোমুখি হয় নি। একনিষ্ঠ সংবাদ বাহক হিসেবে তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট ছিলেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি...।[107]

আর ইমামীয়া শিয়ারা (বর্তমান সময়ের ইরান, ইরাকের শিয়ারা) মনে করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জোর-জবরদস্তিমূলক প্রচেষ্টা

---

[107] ঐসব বড় বড় কল্পনাবিলাসী, অপবাদদানকারী ও পথভ্রষ্টদের কেউ কেউ স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফল হন নি। আর এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে যিনি সফল হবেন, তিনি হলেন তাদের ধারণাকৃত অদৃশ্য মাহদী (অর্থাৎ তাদের মাহদী)। দেখুন: আল-আশকার, আর-রাসূল ওয়ার রিসালাত, পৃষ্ঠা ২১২, ২১৩

চালিয়েছেন, কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী তা শুধু তিনজন অথবা চারজনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর পর্যন্ত ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, বাকিরা তাঁর মৃত্যুর পর পরেই ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে (না'উযুবিল্লাহ) এবং তারা দাবী করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য ও তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে এবং তার কোনো প্রকার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় নি।

আর এ ধারণা মানবতার সংস্কারের ক্ষেত্রে হতাশাজনক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, আরও নিয়ে যায় ইসলামী জীবন পদ্ধতি এবং শিক্ষাদান ও নৈতিক চরিত্র গঠনে তার শক্তি ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের দিকে, অনুরূপভাবে এ ধারণা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে সন্দেহের দিকে নিয়ে যায়; কারণ তাদের দাবীর অত্যাবশ্যক পরিণতি দাঁড়ায়, যে দীন বিশ্বের জন্য হাতে গোণা কয়েকজন বাস্তববাদী সফল আদর্শ নেতা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় নি, আরও সক্ষম হয় নি দা'ঈ বা আহ্বায়ক ও তার রিসালাতের প্রথম দায়িত্বশীলের যুগেই একটি আদর্শ সমাজ উপহার দিতে; তাহলে কীভাবে নবুওয়াতের যুগ থেকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার এ অনুসারীগণ তা দিতে সক্ষম হবে?!

আর (অপবাদদানকারীদের দাবী অনুযায়ী) যখন এ দা'ওয়াতের প্রতি বিশ্বাসীগণ যথাযথ ঐকান্তিকতার ওপর অটল থাকতে সক্ষম হয় নি এবং তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান বন্ধুর নিকট চলে যাবার পরে তাঁর দেওয়া অঙ্গীকারগুলো অনুশীলন করে নি, যে সঠিক পথের ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদেরকে রেখে গেছেন সে পথের ওপর শুধু চারজন ব্যতীত আর কেউ অটল থাকতে পারে নি। সুতরাং কীভাবে আমরা মেনে নেব যে, এ দীন আত্মার পরিশুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযুক্ত

ভূমিকা রাখতে পারবে? আর কীভাবে তা মানুষকে বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে এবং তাকে মানবতার শিখরে উঠাতে সক্ষম হবে? বরং কখনও কখনও বলা হয়, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওয়াতে সত্যবাদী হতেন, তাহলে তাঁর শিক্ষাসমূহও প্রভাব বিস্তারকারী হত, সেখানে এমন কাউকে পাওয়া যেত, যে তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করত এবং তাদের বিশাল সংখ্যার মধ্য থেকে এমন অনেককে পাওয়া যেত, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত এবং ঈমানের ওপর অটল থাকত। সুতরাং তাঁর সাহাবীগণ যদি কয়েকজন ব্যতীত বাকি সকলেই তাদের ধারণা অনুযায়ী মুনাফিক ও মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যেত, তাহলে কে ইসলামকে অব্যাহত রাখবে? আর কোন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা উপকৃত হবে? আর কীভাবেই বা তিনি জগতসমূহের জন্য রহমত (রাহমাতুল লিল 'আলামীন) বলে বিবেচিত হবেন?![108]

---

[108] শাইখ আবূল হাসান আন-নদভী, সূরাতানে মুতাদাম্মাতান, শব্দের রূপ পরিবর্তন করে, পৃষ্ঠা ১৩/৫৩/৫৪/৫৮/৫৯

চতুর্থ অধ্যায়:

সাহাবীগণের মধ্যকার সংঘটিত ঘটনা নিয়ে সমালোচনা থেকে বিরত থাকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا ذكر أصحابي فامسكوا، وإذا ذكر القدر فامسكوا، وإذا ذكر النجوم فامسكوا».

“যখন আমার সাহাবীগণকে নিয়ে সমালোচনা হবে, তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। আর যখন তাকদীর নিয়ে আলোচনা হবে, তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে আর যখন তারকারাজি তথা জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হবে, তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে।”[109]

আর এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নীতি হলো সাহাবীগণের ভুল-ত্রুটি আলোচনা এবং তাদের বিচ্যুতি বা পদস্খলনের বিষয়ে সমালোচনা থেকে বিরত থাকা, আর তাদের মধ্যকার সংঘটিত বিতর্কের মধ্যে ডুবে না থাকা।

আবু না‘য়ীম রহ. বলেন, “সুতরাং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের ভুল-ত্রুটি আলোচনা এবং তাদের বিচ্যুতি বা পদস্খলনের বিষয়ে সমালোচনা থেকে বিরত থাকা, তাদের ভালো ও সুন্দর দিকসমূহ এবং তাদের গুণাবলী ও কৃতিত্বসমূহ প্রকাশ করা, আর তাদের কর্মকাণ্ডসমূহকে অনিবার্য কারণের দিকে ফিরিয়ে দেওয়াটা তাদেরকে যথাযথ অনুসরণকারী মুমিনদের লক্ষণ, যাদের প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে:

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

---

[109] তাবারানী, আল-কবীর: ২/৭৮; আবু না‘ঈম, আল-হিলইয়া: ৪/১০৮; আর আল-ইমামা এর মধ্যে বর্ণিত আছে, ইবনু মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর হাদীস থেকে এবং আলবানী কয়েকটি সনদের মাধ্যমে বর্ণনাটিকে শক্তিশালী করেছেন; আস-সিলসিলাতুস সহীহা: ১/৩৪

“আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

তিনি নির্দেশিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আরও বলেন: “তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ভালো ও সুন্দর দিকসমূহ এবং তাদের মর্যাদা ও ফযীলতসমূহ আলোচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন নি। তাদেরকে শুধু তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা এবং রাগজনিত উত্তেজনার সময় তাদের থেকে যেসব বাড়াবাড়ি হয়েছে, তার সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”[110]

হাদীসে নির্দেশিত বিরত থাকার মানে নির্দিষ্ট বিষয়ে বিরত থাকা, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধসমূহ ও মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে ডুবে না থাকা এবং বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা না করা আর এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণের মাঝে প্রকাশ না করা অথবা এক দলের দোষ ধরা এবং অপর দলের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের পিছনে না লাগা।[111]

আর আমাদেরকে পূর্বে যা অতিবাহিত হয়েছে, সে বিষয় আলোচনার নির্দেশ দেওয়া হয় নি; বরং আমাদেরকে শুধু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে, তাদেরকে ভালোবাসতে এবং তাদের সৌন্দর্যপূর্ণ দিক ও

---

[110] আল-ইমামা, পৃষ্ঠা ৩৪৭

[111] মুহাম্মদ ইবন সামেল আল-‘আলইয়ানী আস-সুলামী, মানহজু কিতাবাতিত্ তারিখিল ইসলামী: পৃষ্ঠা ২২৭, ২২৮

মর্যাদাপূর্ণ বিষয়গুলো প্রকাশ করতে; কিন্তু যখন কোনো বিদ'আতপন্থী আত্মপ্রকাশ করে তাদের ব্যাপারে অপবাদ দেয়, তখন জরুরি ভিত্তিতে তাদেরকে সে অপবাদ থেকে রক্ষা করা এবং ইলম ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এমন বিষয় আলোচনা করা, যা তার যুক্তিকে অসার করে দিবে তা বর্ণনা করা অপরিহার্য।[112]

আর এটি এমন একটি বিষয়, আমাদের সময়ে আমরা যার প্রয়োজন অনুভব করি, যেমন মুসলিম জাতিকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও মদরাসাসমূহে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে এমন কতগুলো সিলেবাসের মাধ্যমে, যা তার সৃজনশীল ও শিক্ষা সম্পর্কিত কতৃপক্ষের চিন্তার ফসল। তারা সাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত অনাকাঙ্খিত ঘটনার মাঝে ডুবে থাকে অন্যায়ভাবে, কোনো প্রকার আদব-কায়দার তোয়াক্কা না করেই, যা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আফসোসের বিষয় হলো, এ শত্রুতামূলক আচরণ কোনো কোনো ইসলামপন্থী ব্যক্তির মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে, এমনকি তাদের কেউ কেউ সাহাবীগণের মধ্যে সংঘটিত বিশৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ থেকে বাজে বর্ণনা কিংবা দামী কথা সংগ্রহ করে, অতঃপর সে বিশেষজ্ঞ ইমামদের কথা ও তাদের বিশ্লেষণসমূহের কোনো প্রকার সঠিক দিকনির্দেশনা তোয়াক্কা না করেই সেগুলোর উপর ভিত্তি করে সাহাবীগণের ব্যাপারে হুকুম দেওয়া আরম্ভ করে দেয়, এ জন্যই আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যে, আমরা এমন কিছু মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করব, যেগুলো একজন গবেষকের জন্য জেনে নেওয়া উচিত হবে, যখন তিনি সাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত বিষয় নিয়ে

[112] মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২৫৪, সম্পাদনা: ড. রাশাদ সালেম।

গবেষণা করার প্রয়োজন অনুভব করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়: সাহাবীগণের ইতিহাস আলোচনার মূলনীতিমালা

প্রথমত: সাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত বিষয় নিয়ে কথা বলাটাই আসল নয়; বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট মৌলিক আকীদাগত বিষয় হলো সাহাবীগণের মাঝে (অনাকাঙ্খিতভাবে) সংঘটিত বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। আর এটাই আকীদা বিষয়ে লিখিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল কিতাবে বিস্তৃত হয়ে আছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বলের 'আস-সুন্নাহ', ইবন আবি 'আসেমের 'আস-সুন্নাহ', আস-সাবুনীর 'আকীদাতু আসহাবিল হাদীস', ইবনু বাত্তার 'আল-ইবানা', ত্বহাবীয়া ইত্যাদি।

আর এটা জোর দেয়, ঐ ব্যক্তির নিকট এ ধরনের বিষয় আলোচনা করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টিকে, যার নিকট এমন আলোচনা করলে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে আর এ ধরনের জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে তার স্মৃতিতে সাহাবীগণ, তাদের ফযীলত, মর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতার সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে, তার সাথে ঐসব বর্ণনার বিরোধের মাধ্যমে, তার বয়সের স্বল্পতার কারণে বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে না পারার কারণে অথবা দীনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার নতুনত্বের কারণে... সাহাবীগণের মাঝে যা সংঘটিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাদের ইজতিহাদী তথা গবেষণাগত মতবিরোধের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করতে না পারা। ফলে সে এমন ফিতনা বা বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হবে যে, সে তার অজান্তেই সাহাবীগণের মর্যাদাহানি করে বসবে।

আর এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী আলেমদের নিকট একটা স্বীকৃত শিক্ষানীতির ভিত্তি, আর তা হলো: জনগণের নিকট এমন কোনো জ্ঞানগত মাসআলা বা বিষয় পেশ না করা, যা তাদের আকল বা মেধা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। ইমাম

বুখারী রহ. বলেন: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا [পরিচ্ছেদ: বুঝতে না পারার আশঙ্কায় ইলম শিক্ষায় কোনো এক কওম (গোত্র বা জাতি)-কে বাদ দিয়ে অন্য আরেক কওমকে বেছে নেওয়া।][113] আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

«حدثوا الناس بما يعرفون , أتحبون أن يكذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم».

“তোমরা মানুষের কাছে সে ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পছন্দ কর যে, আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক?”[114]

আর হাফেয ইবন হাজার ‘আসকালানী রহ. এর ব্যাখ্যায় ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে বলেন: “এর মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাধারণ জনগণের নিকট ‘মুতাশাবেহ’ বা অস্পষ্ট বিষয় আলোচনা করা উচিত নয়।”

অনুরূপ কথা বলেছেন ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু:

«مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً».

“যখন তুমি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করবে যা তাদের বোধগম্য নয়, তখন তা তাদের কারও কারও পক্ষে ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে।”[115]

অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ রহ., তিনিও অপছন্দ করতেন ঐসব হাদীস নিয়ে আলোচনা করা, যেগুলোর বাহ্যিক আবেদন হলো ক্ষমতাসীন ব্যক্তির বিরুদ্ধে

---

113 ফতহুল বারী: ১/১৯৯; সহীহুল বুখারী: ১/৪১, ইলম অধ্যায়, বাব নং ৪৯ (মুদ্রণ: তুর্কী)।

114 ইমাম বুখারী র. তাঁর সহীহ গ্রন্থের ইলম অধ্যায়ের, ৪৯ নং পরিচ্ছেদে এ হাদীসখানা বর্ণনা করেন।

115 সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাতুস সহীহ, ১/১১; আর দেখুন: তার তাখরীজসহ, ‘জামে‘উল উসুল, ৮/১৭

বিদ্রোহ করা। ইমাম মালেক রহ. অপছন্দ করতেন সিফাত তথা গুণাবলীর হাদীসসমূহ নিয়ে বেশি আলোচনা করতে। ইমাম আবু ইউসূফ রহ. অপছন্দ করতেন দুর্বোধ্য অর্থসম্পন্ন হাদীসসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে...শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন: "আর এ (দুর্বোধ্য অর্থসম্পন্ন হাদীস) ব্যাপারে বিধিবদ্ধ নিয়ম হলো, হাদীসের বাহ্যিক দিকটি বিদ'আতকে শক্তিশালী করবে এবং তার বাহ্যিক দিকটি মূলত উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যে ব্যক্তির ব্যাপারে তার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের আশঙ্কা করা হবে তার নিকট এ ধরনের হাদীস আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা। আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন।"[116]

দ্বিতীয়ত: যখন সাহাবীগণের মাঝে (অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে) সংঘটিত বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিবে, তখন অবশ্যই সাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত বিশৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের সত্য-মিথ্যা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦﴾ [الحجرات: ٦]

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।" [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৬]

এ আয়াত মুমিনদেরকে তাদের নিকট ফাসিকদের মাধ্যমে আসা সংবাদের ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা বিচার-বিশ্লেষণ করার নির্দেশ দিচ্ছে, যাতে তার আবশ্যকীয়তা দ্বারা জনগণের ওপর এমন কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া না

---

[116] ফতহুল বারী: ১/১৯৯-২০০; আরও চমৎকার আলোচনা দেখুন, আস-সুলামী, মানহজু কিতাবাতিত্ তারিখিল ইসলামী: পৃষ্ঠা ২২৮

হয়, যার কারণে তারা লজ্জিত হবে। সুতরাং মুমিনদের নেতা সাহাবীগণের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে বিচার-বিশ্লেষণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক হওয়াটা অতি উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত। বিশেষ করে আমরা জানি যে, এসব বর্ণনাগুলোর মধ্যে মিথ্যা ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, হয় মূল বর্ণনার দিক থেকে অথবা কম ও বেশি করার মাধ্যমে বিকৃত করা হয়েছে, ফলে বর্ণনাটি নিন্দা ও অপবাদের উৎপত্তিস্থলে পরিণত হয়। আর এ প্রসঙ্গে বর্ণিত বর্ণনাগুলোর অধিকাংশই সুস্পষ্ট অপবাদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদীগণ বর্ণনা করেছে। যেমন, আবু মিখনাফ লূত ইবন ইয়াহইয়া, হিশাম ইবন মুহাম্মদ ইবন সায়েব আল-কালবী এবং তাদের উভয়ের মতো আরও অনেকে।[117]

এ জন্য সাহাবীগণের সৌন্দর্য বা সততা এবং তাদের মর্যাদার বিবরণ সংক্রান্ত মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনাসমূহকে এমন বর্ণনার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা বৈধ হবে না যে বর্ণনাগুলোর কিছু বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত, কিছু বিকৃত। কারণ, সন্দেহপূর্ণ বিষয় দ্বারা নিশ্চিত বিষয়ের নড়চড় হয় না। আর তাদের মার্যাদার ব্যাপারে যা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত আছে, আমরা তা নিশ্চিতভাবে জানি। সুতরাং বর্ণনার ক্ষেত্রে সন্দেহপূর্ণ কোনো বিষয় এ ক্ষেত্রে দোষারোপ করতে পারে না।[118]

তৃতীয়ত: যখন বিশুদ্ধতা যাছাইয়ের মানদণ্ডে বর্ণনাটি সহীহ হবে এবং তার বাহ্যিক অর্থটি নিন্দা বা অপবাদের মত মনে হবে, তখন তাদের জন্য অপবাদ

---

[117] মিনহাজুস সুন্নাহ: ৫/৭২ এবং তার পরবর্তী পৃষ্ঠা ৮১; আরও দেখুন সমালোচনামূলক পর্যালোচনা: ইয়াহইয়া আল-ইয়াহইয়া রচিত, মারবিয়াতু আবি মিখনাফ ফিত তারিখিত তাবারী -রাশেদীনের যুগ, মুদ্রণ: দারুল 'আসিমা, ১৪১০ হি.

[118] মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/৩০৫ (শব্দের রূপ পরিবর্তন করে)।

থেকে মুক্ত করার সর্বোত্তম পথ ও উপায় অনুসন্ধান করবে। ইবন আবু যায়েদ বলেন, মানুষের উপর তাদের হক হচ্ছে তাদের মাঝে (অনাকাঙ্খিতভাবে) সংঘটিত বিতর্কের বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকা আর মানুষের নিকট তাদের অন্যতম হক বা অধিকার হলো, তাদের জন্য (মন্দ সমালোচনা থেকে) বের হওয়ার সর্বোত্তম পথ অনুসন্ধান করা এবং তাদের ব্যাপারে সর্বোত্তম ধারণা পোষণ করা।[119]

ইবন দাকীকুল 'ঈদ রহ. বলেন: "তাদের মাঝে সংঘটিত বিষয় ও তারা যে ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন, সে বিষয়ে তাদেরকে নিয়ে যেসব বর্ণনা এসেছে, তার মধ্য থেকে কিছু বর্ণনা এমন, যা বাতিল ও মিথ্যা। সুতরাং কেউ যেন সে দিকে দৃষ্টি না দেয় আর তন্মধ্যে যা বিশুদ্ধ আমরা তার উত্তম ব্যাখ্যা করব। কারণ, পূর্বে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রশংসা বিবৃত হয়েছে আর তাদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সমালোচনামূলক যেসব কথা আলোচিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। আর সন্দেহ ও ধারণাপূর্ণ বিষয় বাস্তব ও জ্ঞাত বিষয়কে বাতিল করতে পারে না।"[120] তাদের দোষারোপ করে যত বর্ণনা এসেছে, তার সবগুলোর ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য।

চতুর্থত: আর তাদের মাঝে সংঘটিত বিষয়ে বিশেষভাবে যা বর্ণিত হয়েছে এবং বিশুদ্ধতা যাছাইয়ের মানদণ্ডে যা সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তারা ছিলেন মুজতাহিদ তথা গবেষক আর এটা তখন হয়, যখন সমস্যাগুলো সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ হয়। সুতরাং যখন সমস্যাগুলোর সন্দেহ ও সংশয়ের ব্যাপারটি

---

[119] মুকাদ্দামাতু রিসালাতি ইবনে আবি যায়েদ আল-কায়রাওয়ানী: ৮; আরও দেখুন: আত-তাতানী (মৃ. ৯৪২ খ্রি.), তানবীরুল মাকালা ফী হাল্লি আলফাযির রিসালাত, বিশ্লেষণ: ড. মুহাম্মদ ইবন 'আয়াশ, ১/৩৬৭ এবং তার পরবর্তী পৃষ্ঠা।

[120] আবদুল আযীয আল-'আজলান, আসহাবু রাসূলিল্লাহ ওয়া মাযাহিবুন্নাস ফী হিম, পৃষ্ঠা ৩৬০

প্রকট আকার ধারণ করে, তখন তাদের ইজতিহাদ বা গবেষণা বিরোধপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন:

১. প্রথম শ্রেণী: ইজতিহাদের মাধ্যমে তাদের নিকট স্পষ্ট হয় যে, এ পক্ষের মধ্যেই হক বা সত্য বিষয়টি বিদ্যমান আর তার বিরোধিতাকারী হলো বিদ্রোহী। সুতরাং তাদের ওপর আবশ্যক হয়ে যায় তাকে সাহায্য করা এবং তার বিরোধিতাকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করা যা তারা বিশ্বাস করেছে। অতঃপর এ কাজ করেছে আর এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য তার বিশ্বাস অনুযায়ী বিদ্রোহীদের লড়াইয়ের মুকাবিলায় ন্যায়পরায়ণ ইমামকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকাটা বৈধ ছিল না।

২. দ্বিতীয় শ্রেণী: আর দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহাবীরা হলেন তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, ইজতিহাদের মাধ্যমে তাদের নিকট স্পষ্ট হয় যে, হক বা সত্য বিষয়টি অপর পক্ষের সাথেই রয়েছে। সুতরাং তাদের ওপর আবশ্যক হলো তাকে সাহায্য করা এবং তার বিরোধিতাকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করা।

৩. তৃতীয় শ্রেণী: এ শ্রেণীর সাহাবীগণের উপর সমস্যাটি সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ হয়ে উঠে এবং তারা সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেন; কিন্তু তাদের নিকট উভয় পক্ষের কোনো এক পক্ষকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো বিষয়টি স্পষ্ট হয় নি। ফলে তারা উভয় দলকে পরিত্যাগ করে। আর এ পরিত্যাগ করাটাই তাদের পক্ষে ওয়াজিব (আবশ্যক) ছিল। কারণ, মুসলিমের সাথে লড়াই করতে পদক্ষেপ নেওয়া বৈধ নয়, যতক্ষণ না এর যথার্থতা ও উপযুক্ততা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।[121]

অতএব, এ যুদ্ধের ব্যাপারে তারা ব্যাখ্যা দানকারী প্রত্যেক দলেরই একটা

---

[121] মুসলিম, ইমাম নববীর ব্যাখ্যাসহ: ১৫/১৪৯, ১৮/১১; আরও দেখুন, আল-ইসাবা: ২/৫০১, ৫০২; ফতহুল বারী: ১/১৯৯; এহইয়াউ ‘উলুমিদ দীন: ১/১০২

সংশয় ছিল, সে সংশয়ের কারণে তারা বিশ্বাস করত যে, তারা সঠিক পথে আছে। আর এ ধরনের সিদ্ধান্ত তাদেরকে 'আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা থেকে বের করে দেয় না; বরং তারা ফিকহের মাসআলার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ তথা গবেষকদের বিধানের মধ্যে শামিল। সুতরাং এটা তাদের কারও ত্রুটি হওয়াকে অপরিহার্য করে না; বরং তাদের অবস্থান ছিল একটি এবং দু'টি পুরস্কার অর্জনের মধ্যে।[122]

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা জানি যে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ নেতৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে ছিল না, উষ্ট্রের যুদ্ধে ও সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ব্যতীত অন্য কোনো ইমাম বা নেতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করেন নি। আর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও বলতেন না যে, আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বাদ দিয়ে তিনিই ইমাম বা নেতা আর তালহা ও যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাও এ ধরনের কথা বলেন নি; বরং অধিকাংশ আলেমের মতে যুদ্ধটি ছিল (উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস তথা প্রতিশোধ গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে তাদের ইজতিহাদ বা গবেষণার কারণে ঘটে যাওয়া) একটা ফিতনা বা বিপর্যয়। আর তা ন্যায়পন্থী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের মতো একটা যুদ্ধ। আর তা হলো ইমাম ব্যতীত অন্য ব্যক্তির আনুগত্যের প্রশ্নে বিধিসম্মত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সংঘটিত যুদ্ধ, দীনী বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানূনের জন্য যুদ্ধ নয়। অর্থাৎ দীনের মূলনীতির প্রশ্নে বিরোধের কারণে যুদ্ধ নয়।[123]

---

[122] মুজতাহিদ ভুল করলে একটি পুরস্কার এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দু'টি পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে।

[123] মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/৩০৫ (শব্দের রূপ পরিবর্তন করে); তার পরবর্তী আলোচনার জন্য দেখুন, পৃষ্ঠা ৩৪০

উমার ইবন শাব্বাহ বলেন, “কোনো একজনও বর্ণনা করেন নি যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ও তার সাথে যারা ছিলেন, তারা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে খিলাফত প্রশ্নে বিরোধ করেছেন, আর তারা কাউকে আহ্বানও করেন নি যাতে তারা তাকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন; বরং তারা শুধু আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হত্যাকারীদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা এবং তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি উপেক্ষা করার কারণে তার নিকট প্রতিবাদ জানিয়েছেন।”[124]

আর এটাকে সমর্থন করে ইমাম যাহাবী রহ. যা উল্লেখ করেছেন: “আবু মুসলিম আল-খাওলানী ও তার সাথে আরও কিছু মানুষ মিলে তারা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট আগমন করে বলল: আপনি কি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে বিবাদ করছেন, নাকি আপনি তার মতো? জবাবে তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! না, নিশ্চয় আমি জানি তিনি আমার চেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন এবং আমার চেয়ে শাসন ক্ষমতার বেশি হকদার; কিন্তু তোমরা কি জান না যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মাযলুম (নির্যাতিত) অবস্থায় নিহত হয়েছেন, আর আমি তার চাচাত ভাই এবং আমি তার রক্তের বদলা দাবি করছি। সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং তাকে বল, তিনি যেন উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হত্যাকারীদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তারা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট আসল এবং তার সাথে এ প্রসঙ্গে কথা বলল; কিন্তু তিনি তাদেরকে (হত্যাকারীদেরকে) তার নিকট সোপর্দ করেন নি।”[125]

ইবন কাছীরের এক বর্ণনায় আছে: “ঐ সময়ে শাম তথা সিরিয়াবাসী মুয়াবিয়া

---

[১২৪] উমার ইবন শাব্বাহ, আখবারুল বসরা, ফতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত: ১৩/৫৬

[১২৫] যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা: ৩/১৪০; বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের সনদে তা বর্ণনা করা হয়, যেমনটি বলেছেন আরনাউত।

রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে যুদ্ধ করার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।"[126]

তাছাড়া অধিকাংশ সাহাবী এবং অধিক মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীগণের মধ্য থেকেও অধিকাংশই ফিতনায় অংশগ্রহণ করেন নি। আব্দুল্লাহ ইবন ইমাম আহমদ রহ. বলেন,

«حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما حضرها منهم مئة، بل لم يبلغوا ثلاثين».

"আমার নিকট আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন ইসমা'ঈল ইবন 'উলাইয়া, তিনি বলেন: আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী, তিনি হাদীস বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবন সীরীন থেকে, তিনি বলেন: ফিতনার উৎপত্তি হলো এমতাবস্থায় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন দশ হাজারের মতো। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একশত জনও তাতে উপস্থিত হয় নি; বরং তাদের সংখ্যা ত্রিশ জনেও পৌঁছে নি।"[127]

ইমাম ইবন তাইমিয়্যা রহ. বলেন: "এ সনদটি জমিনের উপরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদের অন্তর্ভুক্ত। আর মুহাম্মদ ইবন সীরীন তার কথা বলার ক্ষেত্রে বেশি আল্লাহ ভীরু মানুষ, আর তার মুরসাল বর্ণনাসমূহ সবচেয়ে বিশুদ্ধ মুরসাল বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।"[128]

---

[126] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৩২; আরও দেখুন ইমামুল হারামাইনের বক্তব্য এবং তার ওপর আত-তাবানী'র ব্যাখ্যা; ইতহাফু যবিউন নাজাবা, পৃষ্ঠা ১৫২, ১৫৩

[127] মাওসু'আতু আকওয়ালিল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল ফিল জারহে ওয়াত তা'দীল, ক্রমিক নং ৪৩১৮

[128] মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২৩৬, ২৩৭; একই জায়গায় অন্যান্য বক্তব্যসমূহ দেখুন, যা ফিতনা

সুতরাং কোথায় ন্যায়পরায়ণ গবেষকগণ, তারা এ ধরনের বিশুদ্ধ বক্তব্যসমূহ অধ্যয়ন করবে, যাতে তা তাদের জন্য শুভসূচনা হবে, তারা তাদের মেধা বা স্মৃতিকে ঐতিহাসিকদের তালগোল পাকানো ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কথাবার্তা দ্বারা কলুষিত করবে না। অতঃপর তারা তাদের নিকট যে মধুময় মুলধন বা পুঁজি রয়েছে, সে অনুযায়ী বিশুদ্ধ নস বা বক্তব্যসমূহকে ব্যাখ্যা করবে।

পঞ্চমত: সাহাবীগণের ইজতিহাদ (গবেষণা) ও তাদের ব্যাখ্যাদান সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সংঘটিত ফিতনা বা বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে মুসলিম ব্যক্তির যে বিষয়টি জেনে রাখা খুবই জরুরি তা হলো, সাহাবায়ে কিরামের মনে এ বিষয়ে ভীষণভাবে দুঃখ পাওয়া এবং চলমান ঘটনায় তাদের লজ্জিত হওয়া প্রমাণ করে যে তাদের নেক নিয়তের কোনো ঘাটতি ছিল না। এমনকি তাদের মনে কখনও এ কথা উদয় হয় নি যে, বিষয়টি অচিরেই এত দূর পর্যন্ত পৌঁছাবে যে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, বরং তাদের কেউ কেউ প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যখন তার নিকট তার অপর সাহাবী ভাইয়ের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছল; বরং তাদের কেউ কেউ কল্পনাও করতে পারে নি যে, বিষয়টি খুব দ্রুত যুদ্ধে রূপ নিবে। আপনার উদ্দেশ্যে এ নস বা বক্তব্যসমূহ থেকে কিছু সংখ্যক উপস্থাপন করা হল:

এ তো ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, যা যুহুরী রহ. তার থেকে বর্ণনা করেন:

«إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبداً».

“আমি তো শুধু মানুষের মাঝে আমার অবস্থানকে সংরক্ষণ করতে চেয়েছি

তথা বিপর্যয়ের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতির প্রমাণ করে।

মাত্র। আর ভাবতেই পারি নি যে, মানুষের মাঝে যুদ্ধ লেগে যাবে আর আমি যদি এটা জানতে পারতাম, তবে আমি কখনও এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতাম না।”[129]

আর তিনি যখন পাঠ করতেন:

﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الاحزاب: ٣٣]

“আর তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে অবস্থান কর।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩] তখন তিনি কাঁদতেন, এমনকি চোখের পানিতে তার উড়না ভিজে যেত।”[130]

আর এ আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে শা‘বী রহ. বলেন: “যখন তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিহত হন এবং আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে নিহত অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি তার চেহারা থেকে ধুলোবালি মুছতে শুরু করলেন এবং বলেন, আলীর বন্ধু হে আবু মুহাম্মদ! আমি তোমাকে আকাশের নক্ষত্রের নিচে অত্যাধিক ঝগড়ার মাঝে দেখতাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নিকট আমার অপারগতা ও কষ্টের কথা ব্যক্ত করব এবং তিনি ও তার সঙ্গীগণ তার ব্যাপারে কাঁদলেন। আর তিনি বললেন,

«يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة».

“হায়! আমি যদি এ দিনের বিশ বছর পূর্বে মারা যেতাম, তাহলে কতইনা ভালো হত।”[131]

আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আরও বলেন:

---

[129] যুহুরীর মাগাযী, পৃষ্ঠা ১৫৪

[130] যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা: ২/১৭৭

[131] ইবনুল আছীর, উসুদুল গাবা: ৩/৮৮, ৮৯

«يا حسن , يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا , ود أبوك : لو مات قبل هذا بعشرين سنة».

“হে হাসান! হে হাসান! তোমার পিতা ধারণা করতে পারে নি যে, বিষয়টি এ পর্যায়ে পৌঁছাবে। তোমার পিতা কামনা করে, সে যদি এ ঘটনার বিশ বছর পূর্বে মারা যেত, তাহলে কতইনা ভালো হত।”[132]

আর তিনি সিফফীনের রাত্রিসমূহে বলতেন:

«لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد ابن مالك (وهما ممن اعتزل الفتنة) إن كان برا إن أجره لعظيم وإن كان إثما إن خطره ليسير».

“আল্লাহর কসম! সাফল্যজনক স্থানে অবস্থান করেছে আবদুল্লাহ ইবন উমার ও সা‘দ ইবন মালেক (আর তারা উভয়ে ফিতনা থেকে দূরে অবস্থান করেছিলেন); যদি তা পুণ্যের কাজ হয়, তবে তার প্রতিদান মহান; আর যদি তা পাপজনক সিদ্ধান্ত হয়, তবে তার শঙ্কা খুবই সামান্য।”[133]

সুতরাং এ হলো আমীরুল মুমিনীনের কথা; যদিও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের কথা হল: নিশ্চয়ই আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং তাঁর সাথে যারা ছিলেন, তারা সত্যের কাছাকাছি ছিল।”[134]

আর এ তো যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها فقال له مولاه أتسميها فتنة وتقاتل فيها قال ويحك إنا نبصر ولا نبصر ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمر فإن لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر».

“নিশ্চয় এটি সেই ফিতনা, যার সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতাম। (আর তিনি

---

132 মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২০৯

133 প্রাগুক্ত: ৬/২০৯

134 ফতহুল বারী: ১২/৬৭

হলেন ঐ ব্যক্তি, যিনি ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন)। সুতরাং তার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) তাকে উদ্দেশ্য করে বলল: আপনি এটাকে ফিতনা বলে আখ্যায়িত করছেন এবং তাতে আবার যুদ্ধও করছেন? জবাবে তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! আমরা তো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করব এবং শুধু তাকিয়ে দেখব না। এ ব্যাপারে আমার অবস্থান স্থল নিশ্চিতভাবে না জেনে আমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। কারণ, আমি জানি না, এ ক্ষেত্রে আমি কি সামনে অগ্রসর হব, নাকি পিছনে যাব।”[135]

আর এ তো মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, যখন তার নিকট আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’র মৃত্যুর সংবাদ আসল তখন তিনি বসে পড়লেন এ কথা বলতে থাকলেন:

إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل يبكي فقالت له فاختة: أنت بالامس تطعن عليه واليوم تبكي عليه، فقال: ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره، و في رواية: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل و الفقه و العلم.

“নিশ্চয় আমরা আল্লাহর আর আমাদেরকে তার নিকট ফিরে যেতে হবে (إنا لله وإنا إليه راجعون)। আর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। অতঃপর তার স্ত্রী বললেন, তুমি গতদিন তার সাথে যুদ্ধ করেছে আর আজ কাঁদছ? জবাবে তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! আমি তো শুধু কাঁদছি এ জন্য যে, তার মৃত্যুতে জনগণ তার বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, অবদান, অভিজ্ঞতা ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে: তোমার জন্য আফসোস! নিশ্চয় তুমি জান না, তার মৃত্যুতে জনগণ অবদান, ফিকহ বা বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান থেকে কী পরিমাণ বঞ্চিত

---

[135] তারিখুত তাবারী: ৪/৪৭৬

হয়েছে।”[136]

আর এত সব বর্ণনার পরেও কীভাবে তাদেরকে এমন সব বিষয়ের মাধ্যমে তিরস্কার করা হবে, যেসব বিষয় তাদের নিকট সংশয়পূর্ণ ছিল। অতঃপর তারা সে বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণা করেছেন, তাদের কেউ কেউ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং বাকিরা ভুল করেছেন। আর তাদের সকলেই একটি প্রতিদান বা দু’টি প্রতিদানের প্রাপক। আর এর পরেও তারা সংঘটিত অনাকাঙ্খিত ঘটনার কারণে লজ্জিত আর তারা এর থেকে তাওবা করেছেন। আর তারা যে বিপদ-আপদের শিকার হয়েছিলেন, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা‘আলা তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং তার বদলে তাদের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة».

“মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জীবন, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদে সার্বক্ষণিক বালা-মুসিবত লেগে থাকে, শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে হাযির হয় এমতাবস্থায় যে, তার কোনো গুনাহ থাকে না।”[137]

আর ন্যূনতম পক্ষে এ ব্যাপারে তাদের কারও কারও যদি বাস্তবে গুনাহ হয়েও থাকে, তবে আল্লাহ তা‘আলা অনেক কারণে তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

---

[136] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৫, ১২৩

[137] তিরমিযী (আল-মাকতাবা আশ-শামেলা), হাদীস নং ২৩৯৯; তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান সহীহ; ইবনু হিব্বান হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন; হাকেম হাদিসটি বর্ণনা করেন, তিনি এবং যাহাবী তার সম্পর্কে চুপ থাকেন: ১/৪১; আর আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন; মিশকাত, ১/৪৯২, সা‘দের হাদিস থেকে, তিনি (আলবানী) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আস-সহীহা (الصحيحة), হাদীস নং ১৪৪; দেখুন: শাওয়াহেদ (شواهد), ৫/১৪৩, ১৪৫; আরও দেখুন: আল-ফাতহ (الفتح): ১০/১১১, ১১২

তন্মধ্যে প্রধান কারণ হলো তাদের অভিজ্ঞতা বা অগ্রগামীতা, মহৎকার্যাবলী, জিহাদ লড়াই সংগ্রাম, গুনাহ ক্ষমাকারী বিপদ-আপদ, ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাওবা করার মতো অতীত সৎকর্ম, যার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপকে পূণ্যে পরিবর্তন করেন। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ হলেন মহান অনুগ্রহ দানকারী।[138]

ষষ্ঠত: সর্বশেষ আমরা বলব যে, নিশ্চয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ আকীদা বা বিশ্বাস পোষণ করেন না যে, সাহাবীগণের প্রত্যেকেই কবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে মুক্ত (নিষ্পাপ); বরং এক কথায় তাদের পক্ষ থেকে গুনাহ হওয়াটা স্বাভাবিক। আর যদি তাদের থেকে কোনো গুনাহ সংঘটিত হয় তবে তাদের জন্য যে সব অগ্রাধিকার ও মর্যাদার বিষয় রয়েছে, তা তাদের ক্ষমাকে ত্বরান্বিত করে। অতঃপর যখন তাদের কারও পক্ষ থেকে কোনো গুনাহ সংঘটিত হত, তখন হয় তিনি তার থেকে তাওবা করতেন অথবা তাকে এমন সাওয়াব দেওয়া হত, যা সে গুনাহকে মিটিয়ে দিত অথবা তার অগ্রবর্তীতার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হত অথবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, আর তারা হলেন মানুষের মধ্যে রাসূলের শাফা'আত বা সুপারিশ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার অথবা তাকে দুনিয়াতে বালা-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করে তার দ্বারা ক্ষমার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং বাস্তবিক পাপের ক্ষেত্রে যখন এ নিয়ম, তখন কীভাবে এমন বিষয়ে তাদের গুনাহ হবে বা তাদেরকে তিরস্কার করা হবে, যে বিষয়ে তারা ছিলেন মুজতাহিদ বা গবেষক। যদি তারা তাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তাদের জন্য রয়েছে দু'টি সাওয়াব এবং যদি তারা তাতে ভুল সিদ্ধান্তে

[138] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২০৫-২৩৯; তিনি তাতে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

উপনীত হন, তবে তাদের জন্য রয়েছে একটি সাওয়াব। আর ভুলটিকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

অতঃপর মর্যাদা এমন বিষয়, যা তাদের কারও পক্ষ থেকে তুচ্ছ কাজকেও অপছন্দ করে। তবে জাতির মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব, আর ঈমান, জিহাদ, হিজরত, সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা, উপকারী ইলম (জ্ঞান) এবং ভালো কাজের দিক থেকে তাদের সৌন্দর্যের বিবেচনায় সে তুচ্ছ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য।[139]

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন: “তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের রয়েছে ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা আর আছে তাদের মাঝে সংঘটিত অনকাঙ্খিত ত্রুটি মিটিয়ে দেওয়ার মতো আমল, অপরাধ নিশ্চিহ্নকারী জিহাদ এবং পরিশুদ্ধকারী ইবাদত। আর আমরা এমন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হব না, যে ব্যক্তি তাদের কোনো একজনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং আমরা তাদেরকে নিষ্পাপ বলেও দাবি করব না।”[140]

অতএব, সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আমাদের আকীদা বা বিশ্বাস তাদের নিষ্পাপ হওয়াকে আবশ্যক করে না। কারণ, ন্যায়পরায়ণতা হলো চরিত্র ও দীনের দৃঢ়তা। আর এ গুণ অর্জনকারী ব্যক্তি ধাবিত হয় আত্মাকে মজবুতভাবে গঠনের দিকে, যা নির্ভর করে নিরবচ্ছিন্ন তাকওয়া ও ব্যক্তিত্বকে ধারণ করার ওপর। ফলে সে তার সততা দ্বারা তার আত্মার মজবুতি অর্জন করবে... অতঃপর ‘ন্যায়পরায়ণতার জন্য সামগ্রিকভাবে পাপমুক্ত হওয়া শর্ত নয়’ এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই।[141]

---

[139] দেখুন: শরহু খলিল হাররাস ‘আলাল ‘আকিদাতিল ওয়াসিতিয়্যা, পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৭

[140] যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা: ১০/৯৩

[141] আল-গাজালী, আল-মুসতাছফা: ১/১৫৭; আরও অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: আল-আ‘জামী, মানহাজুন নকদ ‘ইনদাল মুহাদ্দিসীন, পৃষ্ঠা ২৩-২৯

আর তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে তাদের দোষ-ত্রুটি ও মন্দ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকাটা ওয়াজিব হবে, যে আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর যদি সাহাবীর ত্রুটি-বিচ্যুতি অথবা ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করাটা জরুরি হয়ে পড়ে, তবে আবশ্যক হলো ঐ আলোচনার সাথে এ সাহাবীর মর্যাদা ও তার অবস্থান পরিষ্কার করা। যেমন, তার তাওবা, জিহাদ করা এবং তার অবদানসমূহের উল্লেখ করা। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমরা যদি হাতেব ইবন আবি বোলতা'আহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু'র তাওবার কথা আলোচনা না করে শুধু তার পদস্খলনের কথা আলোচনা করি, তবে তা পরিষ্কার যুলুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, কোনো অপরাধী তাওবা করলে, তার তাওবা কবুল করা হয়।[142]

সুতরাং কোনো ব্যক্তির জীবনকালের কোনো এক সময়ে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে এবং তা থেকে সে তাওবা করলে, তবে সে কারণে তাকে দোষারোপ করা যাবে না। কারণ, চূড়ান্তভাবে পরিপূর্ণতার বিষয়টিকে বিবেচনা করা হবে, সূচনা লগ্নের অসম্পূর্ণ কোনো বিষয়কে (সিদ্ধান্তের জন্য) বিবেচনা করা হবে না। বিশেষ করে কারও যদি পূণ্যরাশি ও মহৎ কার্যাবলী থাকে এবং কেউ যদি তার প্রশংসা না করে, তবে তার ব্যাপারে কেমন সিদ্ধান্ত হতে পারে, যখন তার স্রষ্টা অন্তর্জ্ঞানী আল্লাহ স্বয়ং তার প্রশংসা করেন।

পরিশেষে আল-কুরআনের ভাষায়:

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠]

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা

[142] আবূ না'য়ীম, আল-ইমামা, পৃষ্ঠা ২৪০-২৪১; মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২০৭

করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের সম্মান ও মর্যাদা

সাহাবীগণ হলেন আল্লাহর তা‘আলার নবী ও রাসূলগণের পরে দুনিয়ার সকল মানুষের মধ্য সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যদাবান মানুষ। আর ঈমানের দিক থেকে তারা হলেন নবী-রাসূলগণের পর অগ্রগামী পূর্বপুরুষ এবং দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গ। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ﴾ [ال عمران: ١١٠]

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য যাদের আগমন হয়েছে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০]

তিনি আরও বলেন:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]

“আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী (সর্বোত্তম) জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির ওপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হতে পারেন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩]

এ আয়াত দু’টি সকল সাহাবীর মর্যাদার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণাপত্র। কেননা, এ বক্তব্যের দ্বারা সরাসরি সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম। তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা সাহাবীগণের উপমা পেশ করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জীলের মতো প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবে, যে কথা তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন এভাবে:

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ

لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ۝٢٩﴾ [الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু‘ ও সাজদায় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডল সাজদাহ’র প্রভাবে পরিস্ফুট। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

তাছাড়া আল-কুরআনের আরও কতগুলো আয়াত রয়েছে যেগুলোতে সাহাবীগণের প্রশংসা, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ রয়েছে, রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি ক্ষমা ও সন্তুষ্টির সুস্পষ্ট ঘোষণা, যে আয়াতগুলো আমরা এ গ্রন্থের শুরুর দিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করেছি।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার সাহাবীগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলেছেন,

«لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ».

“তোমরা আমার সাহাবীগণের কাউকে গালি দিবে না; কারণ, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও দান করে, তবে সে তাদের এক মুদ বা

তার অর্ধেক পরিমাণ দানের সাওয়াবও অর্জন করতে পারবে না।”[143]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

«خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا».

“আমার যুগের উম্মত হলো আমার শ্রেষ্ঠ উম্মত, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে তারা শ্রেষ্ঠ, তারপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে তারা শ্রেষ্ঠ। ‘ইমরান বলেন: আমি জানি না, তিনি তাঁর যুগের পরে দু’টি যুগের কথা উল্লেখ করেছেন, নাকি তিনটি যুগের উল্লেখ করেছেন।”[144]

আর সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ছাড়াও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে আরও অনেক বক্তব্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কিছু বক্তব্য নিম্নরূপ:

১. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ ‘আনহুমা বলেন,

«لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مع النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أربعين سنة».

“তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে গালি দিও না; কারণ, তাদের কোনো একজনের এক ঘন্টা সময় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

---

[143] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: আমি যদি অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণকারী হতাম, হাদীস নং ৩৪৭০; মুসলিম, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: সাহাবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমকে গালি দেওয়া হারাম, হাদীস নং ৬৬৫২

[144] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ফযীলত, হাদীস নং ৩৪৫০; মুসলিম, অধ্যায়: সাহাবীদের ফযীলত, পরিচ্ছেদ: সাহাবী, তৎপরবর্তী ও তৎপরবর্তীদের ফযীলত, হাদীস নং ৬৬৩৮

ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থান করার মূল্যমান তোমাদের কোনো একজনের চল্লিশ বছরের আমলের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম।”[145]

২. আর ওকী‘ রহ.-এর অপর এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহ ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

«لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عبادة أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ».

“তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে গালি দিও না; কারণ, তাদের কোনো একজনের এক ঘন্টা সময় (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে) অবস্থান করার মূল্যবান তোমাদের কোনো একজনের গোটা জীবনের ইবাদতের চেয়েও অনেক বেশি উত্তম।”[146]

৩. মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«لا تسبوا أصحاب محمد إن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون».

“তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহাবীগণকে গালি দিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি জানেন যে, তারা অচিরেই নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে।”[147]

---

145 শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা, শরহু লামিয়া ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১ (মাকতাবা শামেলা, আল-ইসদার আস-সানী)

146 ইমাম আহমদ, ফাযায়েলুস সাহাবা: ১/৫৭; ইবনু মাজাহ, ১/৩১ (আল-আ‘যামী); ইবনু আবি ‘আসেম, ২/৪৮৪; আল-বুসাইরী ‘যাওয়ায়েদু ইবন মাজাহ’ এর মধ্যে (১/২৪) খবরটিকে সহীহ বলেছেন; আল-মাতালেবুল ‘আলীয়া, ৪/১৪৬

147 আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৭৪; আরও দেখুন: মিনহাজুস সুন্নাহ, ২/১৪; আছার, ইমাম আহমদ তা ফাযায়েল অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ১৮৭, ১৭৪১; তার সনদকে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা, ইবন বাত্তার মিনহাজুস সুন্নাহতে হাদীসটি সংযোজন

৪. ইমাম আহমদ রহ. তার আকীদা প্রসঙ্গে বলেন, “সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন নগণ্য সাহাবীর মর্যাদা ঐ যুগের সকল ব্যক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যারা তাকে দেখে নি, যদিও তারা তাদের সকল আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে।”[148]

৫. ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বলেন, “এক মুহূর্তের জন্য হলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য পাওয়ার মর্যাদার সমতুল্য কোনো আমলই হতে পারে না; আর কোনো কিছুর বিনিময়ে তার সমমর্যাদা অর্জন করা সম্ভব নয়। আর ফযীলত বা মর্যাদার বিষয়টি কিয়াসের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় না। এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।”[149]

৬. আর আবু উমার ইবন আবদিল বার রহ ‘আল-ইস্তি‘য়াব’ গ্রন্থে বলেন,

«قد كُفينا البحثَ عن أحوالِهِم، لإجماعِ أهلِ الحقِّ من المسلمين، وهم أهلُ السنة والجماعة؛ على أنهم كلُّهم عدول».

“তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ -এ কথার ওপর মুসলিমগণের মধ্য থেকে হকপন্থীগণের ইজমা‘র কারণে আমাদেরকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানীয় আলোচনা-পর্যালোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে আর হকপন্থীগণ হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত।”[150]

৭. মুহাম্মাদ ইবনুল ওযীর আল-ইয়ামানী সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্নে সংঘটিত ‘ইজমা’-এর বর্ণনা নকল করেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের পক্ষ থেকে এবং শী‘আয়ে যায়েদিয়া ও মু‘তাযিলাদের পক্ষ থেকেও। আর

করেছেন: ২/২২

[148] আল-লালকায়ী, শরহু উসূলি ই‘তিকাদি আহলিস সুন্নাত ১/১৬০

[149] নাওয়াওয়ীর ব্যাখ্যাসহ মুসলিম: ১৬/৯৩

[150] উদ্ধৃত: ড. নূর উদ্দিন ‘আতর, ‘মানহাজুন্ নাকদ ফী ‘উলুমিল হাদীস’, পৃষ্ঠা ১২২

অনুরূপ বক্তব্য আস-সানা'য়ানী রহ.-এরও।[151]

---

[151] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২২

উপসংহার

উপসংহারে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলব যে, সাহাবীগণ হলেন আল্লাহর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী এবং নবী ও রাসূলগণের পরে আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দনীয় ও প্রিয় মানুষ। আর ঈমানের দিক থেকে তারা হলেন অগ্রগামী পূর্বপুরুষ এবং রাহমানের সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গ। তাদেরকে মহব্বত করাটা আনুগত্য ও ঈমান এবং তাদেরকে ঘৃণা করাটা নিফাকী ও সীমালংঘন। তারা হলেন এ উম্মতের মধ্যে মনের দিক থেকে সবচেয়ে সুহৃদ ও সৎ মানসিকতাসম্পন্ন, ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী, জ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, সবচেয়ে কম আনুষ্ঠানিকতা প্রিয়, (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাহচর্য ও সহযোগিতার দিক থেকে তারা অনেক দূর এগিয়ে এবং তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রত্যয়ন ও প্রশংসার দ্বারা তাঁর মহান মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন। তাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে, পুরস্কারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি এবং পরিমাপকের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হলেন সিদ্দীকে আকবর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, তারপর হলেন ‘ফারুক’ নামে প্রসিদ্ধ উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু; আর এ ব্যাপারে সাহাবী ও তাবে‘ঈন মুমিনগণের পক্ষ থেকে ‘ইজমা’ সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর যুন-নূরাইন উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, যিনি বালকদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করেছেন। আর তারা হলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন এবং সুপথপ্রাপ্ত ইমাম। আর তাদের পরবর্তী পর্যায়ের হলেন ‘আশারায়ে মুবাশশিরীনের (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের) অবশিষ্ট ছয়জন। আর তাদের পেছনে রয়েছেন পুণ্যবান মুহাজিরগণের একেবারে প্রথম ধাপের অগ্রগামী দল। তারপর আছেন প্রথম শ্রেণির আনসারগণ। তার পরবর্তী স্তরে

রয়েছেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা পুরস্কারের অধিকারী এবং যাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা আঘাতপ্রাপ্ত ও কঠিন পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। অতঃপর ‘বায়‘আতে রিদওয়ান’-এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাদের জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন, হিজরত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। অতঃপর যিনি মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান এনেছেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন, হিজরত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। আর তাদের সকলের জন্যই রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিশ্রুতি।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরয হলো তাদেরকে মহব্বত করা এবং তাদের সকলের ব্যাপারে (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলে) সন্তুষ্টি কামনা করা। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করে অথবা তাদের দুর্নাম করে এবং তাদের মন্দ সমালোচনা করে, তাকে ঘৃণা করা।

আর যেমনিভাবে মর্যাদার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে তারতম্য রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তাদেরকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও পরিমাণগত তারতম্য হবে। আর তাদেরকে অনুসরণ করা এবং তাদের হিদায়াত বা নির্দেশনা দ্বারা হিদায়াত লাভ করার বিষয়টি নির্ধারিত হবে তাদের মর্যাদার ব্যাপারে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়া অথবা তাদের মর্যাদাকে কোনো রকম খাটো করা ছাড়া। সুতরাং (মনে রাখতে হবে) তারা নিষ্পাপ নন এবং তারা অপরাপর মুমিনগণের কারো মতও নন।

আরও কর্তব্য হচ্ছে তাদের মাঝে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার ব্যাপারে সমালোচনা করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকা এবং তাদের জন্য দো‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনা

করা। সুতরাং শুধু তাদের ভালো ও সুন্দর বিষয়গুলোই আলোচনা করা যাবে, আর যে ব্যক্তি তাদের মন্দ সমালোচনা করবে, সে পথভ্রষ্ট বলে গণ্য হবে এবং কঠিন শাস্তির মুখোমুখী হবে।

পরিশেষে আমাদের আবেদন আল-কুরআনের শিখানো ভাষায়:

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঐ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত করুন, যে ব্যক্তি আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসে, তাদেরকে (অপবাদের অভিযোগ থেকে) রক্ষা করে, তাদের প্রশংসা ও গুণগান করে এবং তাদের জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করে।

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জি

০ আল-কুরআনুল কারীম

১. আল-বুখারী, আল-জামে আস-সহীহ

২. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, আস-সহীহ

৩. আবু দাউদ, আস-সুনান

৪. আন-নাসায়ী, আস-সুনান

৫. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান

৬. ইবন মাজাহ, আস-সুনান

৭. মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ আল-ওহাইবী

৮. ইমাম আহামদ, আল-মুসনাদ

৯. আখলাকু আহলিল কুরআন [আল-মাকতাবা আশ-শামেলা, দ্বিতীয় প্রকাশ]।

১০. আল-লালকায়ী, শরহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাত

১১. ইবনু রজব, জামে'উল 'উলুম ওয়াল হিকাম, দারুল ফুরকান, প্রথম সংস্করণ, ১৪১১ হি.

১২. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, শরহু লামিয়া ৮ম খণ্ড, (আল-মাকতাবা আশ-শামেলা, আল-ইসদার আস-সানী)

১৩. ইমাম আহমদ রহ, ফাযায়েলুস সাহাবা

১৪. ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, আস-সারেমুল মাসলুল, মুদ্রণ: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়াহ, সম্পাদনা: মুহাম্মদ মহিউদ্দীন আবদুল হামীদ।

১৫. ড. নূর উদ্দিন 'আতর, 'মানহাজুন নাকদ ফী 'উলুমিল হাদীস', দারুল ফিকর, প্রথম মুদ্রণ: ১৯৭২

১৬. ড. 'আজ্জাজ আল-খতীব, 'উসূলুল হাদীস', দারুল ফিকর, চতুর্থ সংস্করণ: ১৯৮১

১৭. সম্পাদনা পরিষদ, আল-মু‘জাম আল-ওয়াসীত, হোসাইনিয়া কুতুবখানা, দেওবন্দ (তা.বি)

১৮. ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, মাযহাব: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, সিয়ান পাবলিকেশন, প্রথম বংলা সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৪

১৯. ইবনু হাজার ‘আসকালানী, মা‘আরেফাতুল খিসালিল মুকাফফারা, সম্পাদনা: জাসিম আদ-দাওসারী, প্রথম মুদ্রণ: ১৪০৪ হি.

২০. ইবনুল কায়্যিম, আল-ফাওয়ায়েদ, আল-মাকতাবাতুল কায়্যিমা, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৪ হি

২১. মুহাম্মদ ইবনুল ‘আরাবী আত-তাবানী, ইত্তিহাফু যবিউন নাজাবা, দারুল আনসার

২২. বিবিধ গ্রন্থ, (আল-মাকতাবা আশ-শামেলা, দ্বিতীয় প্রকাশ)